মে ২০১৮ ইং

নূর আলো

THE MONTHLY IMANER ALO

সঠিক আক্বিদা ও আমলের সমন্বয়ে
প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

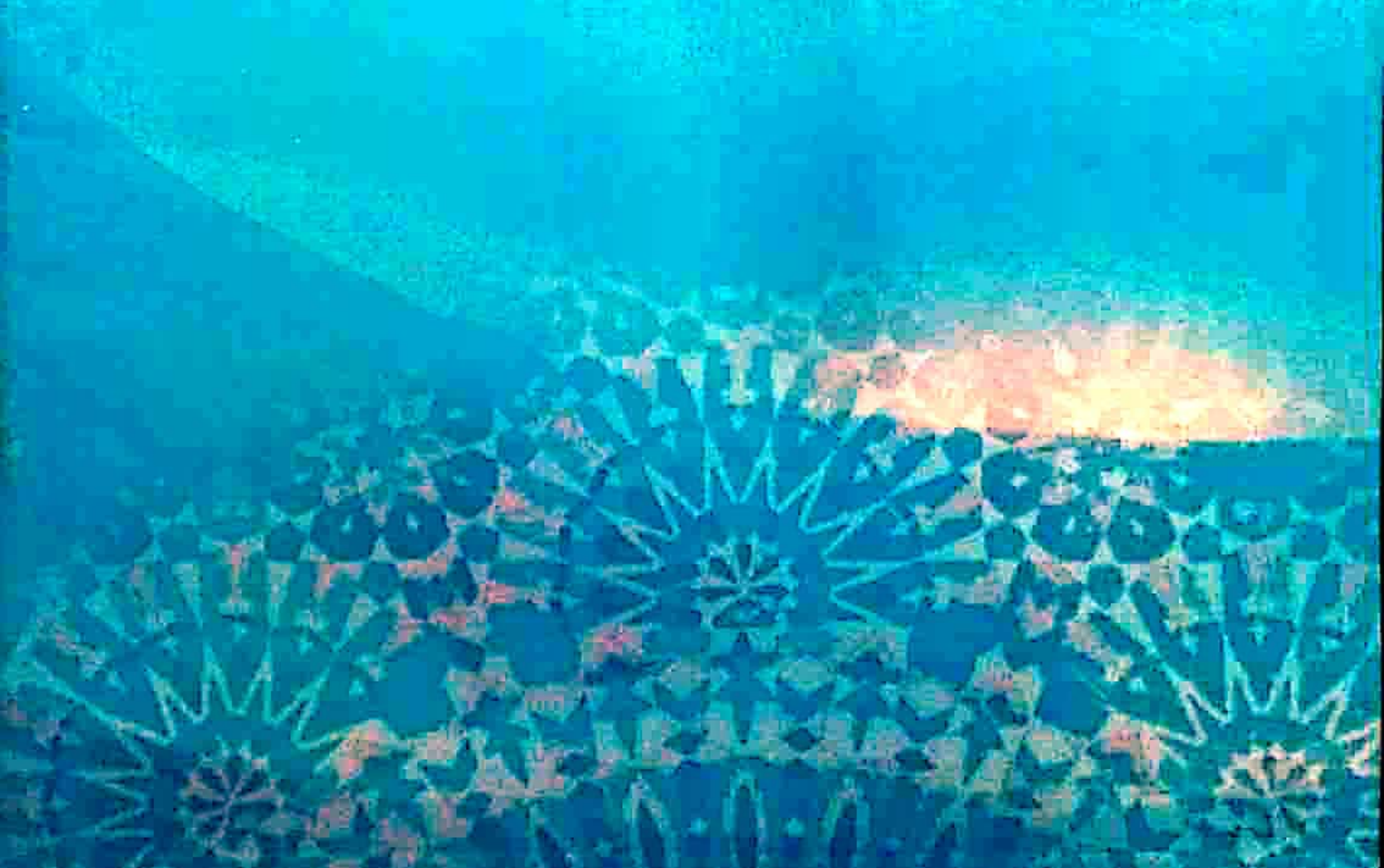

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

রেজি. নং : ১৮৫

মে ২০১৮ ইং

মাসিক ঈমানের আলো
THE MONTHLY IMANER ALO

সঠিক আক্বিদা ও আমলের সমন্বয়ে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

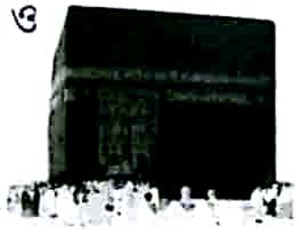

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
আলহাজ্ব মোঃ আইয়ুব রানা

পরিচালনা সম্পাদক
এ এম মঈন উদ্দীন চৌধুরী হালিম

সম্পাদক
অধ্যক্ষ এম. ইব্রাহীম আখতারী

পরিচালক (সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন)
মুহাম্মদ আব্বাস উদ্দীন খোন্দকার

ব্যবস্থাপনায়
আলহাজ্ব গুলছেহের বেগম

সহকারী সম্পাদক
এইচ এম নেজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন নোমানী

যোগাযোগ
সম্পাদক
মিলেনিয়াম প্লাজা (৩য় তলা) সিঙ্গাপুর মার্কেট এর সামনে
১৫৫৮, এক্সেস রোড, আগ্রাবাদ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।
০৩১-২৫১৫০২১, ২৫১৩৭৮৫, ০১৮১৭৭৪৫৬৯৪, ০১৭১২০৩০৯৬৩,
ই-মেইল : editorialmonthlyimaneralo@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- (বিশ টাকা) মাত্র
মুদ্রণে : জিলান গ্রাফিক্স আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মাসিক
ঈমানের আলো
THE MONTHLY IMANER ALO

সঠিক আক্বিদা ও আমলের সমন্বয়ে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৩
- দরসুল কোরআন ঃ সূরা ইবরাহীম ৪
  অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
- দরসুল হাদিস ঃ খোদার কুদরতি ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্তগন ৬
  আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন আলকাদেরী
- দরসুল ফিক্‌হ ঃ যে কোন প্রকারের ইনজেকশান রোযা ভঙ্গকারী ৯
  অনুবাদঃ মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন নোমানী
- ধর্ম ও দর্শন ঃ মি'রাজের বাস্তবতা, তাৎপর্য ও সার্থকতা ১৩
  অধ্যাপক মোহাম্মদ এমদাদুল হক
- রাজনীতি ঃ সংকটাপন্ন গণতন্ত্র উন্নয়ন সহায়ক নয় ১৮
  অধ্যক্ষ এম ইব্রাহীম আখতারী
- মুক্তিযুদ্ধ অতঃপর ২২
  আলহাজ্ব আইয়ুব বানা
- স্মরণীয় বরণীয় ঃ সুন্নীয়ত প্রচারে আল্লামা গাযী আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.)'র অবদান ও আমাদের করণীয় ২৪
  মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন রেযভী
- ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, শ্রমের মর্যাদা ও শিশুশ্রম ৩১
  মাওলানা মুহাম্মদ জানে আলম নেজামী
- জাতীয় সংবাদ ৩৬
- আন্তর্জাতিক সংবাদ ৪৮

খোশ আমদেদ হে মাহে রমজান

মানবজীবনে স্খলনমুক্ত ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ এ রমজান

অবর্ননীয় রহমত, বরকত, মাগফিরাত এর সওগাত নিয়ে সমাগত মাহে রমজান। যেটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি। মানবজীবনে স্খলনমুক্ত ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ এ রমজান। যেটি হচ্ছে পাপ-পঙ্কিলতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্বীয় ঈমানী চেতনাকে শানিত করার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তাই ফজিলত ও বরকতময় এ মাসের জন্য প্রতিক্ষায় প্রহর গুনে বিশ্ব মুসলিম। মহিমান্বিত এ মাস কেবল মুসলিম কমিউনিটিতে নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে তাবৎ বিশ্ববাসীর জন্য মহাকল্যাণের বার্তা বয়ে আনে। তাই এ পবিত্র মাসের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায় সকলেরই আন্তরিকতার পরিচয় দেয়াটা অধিকতর সমিচীন। বরকতমন্ডিত এ মহান মাসটিকে মুসলিম মিল্লাত অতীব ভাবগাম্ভীর্যতার মধ্য দিয়ে পালনে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর অসাধু মজুতদার ব্যবসায়ী এ মহান মাসকেই টার্গেট করে অবৈধভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির পায়তারায় লিপ্ত থাকে। যে কারণে পন্যমূল্য পাগলা ঘোড়ার ন্যায় লাফাতে থাকে এবং বাজার স্বাভাবিক আচরন হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু রমজান মাসে ঘন ঘন বিদ্যুৎ এর লোডশেডিং তথা দুঃসহ যানজটে জনজীবন হয় ওষ্ঠাগত। এমতাবস্থায় ধর্মানুরাগী মানুষের সিয়াম সাধনাকে নির্বিঘ্ন করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ কথা দুঃসহ যানজট নিরসনে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর জোরদার করার উপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় দিনের বেলায় হোটেল রেস্তোঁরা বন্ধ রাখা, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, মাস্তানী ইভটিজিং বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সিনেমা হল বন্ধ রাখা তথা দেওয়ালে দেওয়ালে অশ্লীল পোষ্টার সাটানো বন্ধ করা সহ সর্বপ্রকার গর্হিত কর্মকান্ড বন্ধে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঐতিহাসি মে দিবসের অঙ্গীকার হোক শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা

সভ্যতার বিকাশে শ্রমজীবি মানুষের অবদান কোনভাবেই উপেক্ষিত হবার নয়। কেননা যে সব মানুষের ঘামের উপর দাড়িয়ে আছে আজকের এ পৃথিবী। এসব শ্রমজীবি মানুষ কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নয়। এরাও মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বিস্মিত না হয়ে পারি না। স্মরনাতীত কাল থেকেই খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষগুলো বরাবরই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রম দিয়েও উপযুক্ত মজুরী পেত না। যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পেতো তা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন ছিল তা সত্ত্বেও এরা থাকতো তুষ্ট-পরিতৃপ্ত। প্রায় দেড়শত বছর আগের কথা। মালিক শ্রেণীর শোষন-নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে তাদের মনে ভাব জাগে, মুখে ভাষা জাগে। অতঃপর তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠল। ১৮৬০ সালে মজুরী কর্তন না করে দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমের সময় নির্ধারনের দাবি উঠল। যা ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত দাবি মেনে নেওয়ার সময় সীমা বেঁধে দেয়। কিন্তু এ লক্ষ্যে কোন প্রকার সাঁড়া কিংবা হরকত পরিলক্ষিত না হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে সমবেত হয়। তাদের এ আন্দোলন চলাকালীন ৭জন পুলিশ সদস্যের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ শ্রমিকদের উপর বেপরোয়া গুলি বর্ষন করে। ফলে ১৯ জন আন্দোলনকারী নিরীহ শ্রমিক নিহত হয়। রক্তক্ষয়ী এ আন্দোলনের সফল পরিনতিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা মজুরীর দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। এবং ১ মে প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবি আদায় দিবস হিসেবে। অতএব এ মে দিবসের মাধ্যমেই শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, বছর ঘুরে যে দিবস আসে আবার চলে যায়। সরকার প্রধান, রাজনৈতিক মহল, শ্রমিক সংগঠনের বাণী, আলোচনা সভা ও নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এর সাথে সাথে সবাই ভোগ করে একদিনের মে দিবসের ছুটি। কিন্তু বছরের পর বছর এই মে দিবস পালিত হলেও "যে লাউ সে কদুই" রয়ে গেছে। অতএব আজ শপথ নিতে হবে, শ্রমজীবীসহ সব মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার। সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। শ্রমিকের অধিকারগুলো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

সূরা ইবরাহীম

মক্কী, আয়াত ৫২, রুকু-৭

অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর *

الر ـ كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ـ باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ۝ الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض وويل للكفرين من عذاب شديد ـ الذين يستحبون الحيواة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ـ اولئك فى ضلل بعيد ـ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم ۝ ..... ـ هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولوا الالباب ۝

আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে। আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

অর্থ: আলিফ, লাম, রা (এর সঠিক মর্মার্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন।) এক গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন, তাদের রবের নির্দেশে তাঁরই পথে যিনি মহাপরাক্রমশালী, সকল প্রশংসার অধিকারী। ২। আল্লাহ, আকাশ সমূহ আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর (মালিকানাধীন)। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ।

৩। যাদের নিকট দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনের চেয়ে প্রিয় এবং যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর সেখানে বক্রতা তালাশ করে। তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৪। আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর নিজ জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি সু-স্পষ্টভাবে তাদেরকে বর্ণনা দেন। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান। বস্তুত, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়.....।

৫। এটা মানুষদের কাছে হুকুম পৌঁছে দেয়া এবং যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায়। উপরন্তু তারা যেন জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং বিবেক সম্পন্নরা যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : এটা কুরআন মাজীদের চতুর্দশতম সূরা, সূরা ইবরাহীম। যা হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে- মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরায় ৭টি রুকু, ৫২টি আয়াত, ৮৬১টি পদ এবং ৩৪৩৪টি বর্ণ রয়েছে।

নামকরণ : অত্র সূরায় পঁয়ত্রিশতম আয়াতে উল্লেখিত সম্মানিত নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম অনুসারে সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা ইবরাহীম।

শানে নুযুল : অত্র সূরায় আয়াত সমূহের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি শানে নুযুল পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় তাফসীরে কুরতুবী প্রণেতা আল্লামা কুরতুবী (রহ.) মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন-

روى مقسم عن ابن عباس قال ـ كان قوم امنو ا بعيسى ابن مريم وقوم كفروا به فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم امن به الذين كفرو ا بعيسى وكفر الذين امنوا بعيسى فنزلت هذه الاية ـ

হযরত মিকছাম (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঈসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের একটা অংশ তাঁর ওপর ঈমান এনেছিল আর একটা অংশ তাঁর সাথে কুফরী করেছে। অতঃপর যখন নবী মুহাম্মদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন- তাঁর উপর ঈমান এনেছে, যারা ঈসা (আ.) এর সাথে কুফরী করেছে। আর যারা ঈসা (আ.) এর উপর ঈমান এনেছে তারা এখন কুফরী করে বসেছে- তাদের প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর لباب النقول فى اسباب النزول গ্রন্থে আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) আটাশতম আয়াত-

الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ـ

অর্থ আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরীর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংসের গৃহে টেনে এনেছে।

এর শানে নুযুল বর্ণনায় বলেন- অত্র আয়াত বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া কাফির কুরাইশদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন-

واخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت هذه الاية فى الذين قتلو ا من قريش يوم بدر ـ الم تر الى الذين بدلو ا نعمة الله كفرا ـ

এ সূরার শুরুতে নবুয়্যাত, রিসালাত, হিদায়ত এবং সে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরার পঞ্চম আয়াত থেকে অষ্টম আয়াত পর্যন্ত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এখানে মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তার নানাবিধ শাস্তি থেকে রেহাই দান করেছেন। ফেরআউন তাদেরকে অবর্ণনীয় শাস্তি প্রদান করত, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে জীবন্ত হত্যা করত, কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। এর মাধ্যমে তাদের জাতি বনী ইসরাইলকে নিঃশেষ করার অপচেষ্টা করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি দিলেন। অত্র সূরার অষ্টম আয়াত থেকে আঠারতম আয়াতে নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের আলোচনা, তাদের অবাধ্যতা ও তার পরিণতিতে করুণ পরিস্থিতির আলোচনা এবং তাদের বিপরীতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্যাবলী, বিপদে ধৈর্যের শিক্ষা, সর্বোপরি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার আলোচনা স্থান পেয়েছে। আটারতম আয়াত থেকে বাইশতম আয়াতে আসমান যমীনের সৃষ্টি, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিপতি হওয়া এবং অমুখাপেক্ষী হওয়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে।

অত্র সূরায় সাতাশতম আয়াতে কবর জগতের সাওয়াল-জাওয়াব এবং মৃত্যুর পর কঠিন পরিস্থিতিতে মুমিনদের অবিচল থাকার আলোচনা স্থান পেয়েছে। অত্র আয়াতে মুমিনদের ঈমান ও কালিমায়ে তাইয়্যিবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। মুমিনের কালিমা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ চিরকাল প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতে এবং পরকালে। কালিমার বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা শক্তি প্রদান করেন। যার ফলে সে আমৃত্যু এ কালিমার ওপর অধিষ্ঠিত থাকে। পরকালে এ কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ কবর জগতকে বুঝানো হয়েছে।

কবরে শাস্তি ও শান্তি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ংকর মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর সাহায্যের বদৌলতে এই কালিমার ওপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্বাক্ষ্য প্রদান করবে। যার অর্থ এই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

পক্ষান্তরে যারা কবরে সাওয়ালের জাওয়াব প্রদান করতে পারবে না তাদের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে মহা দুর্ভোগ। বস্তুত আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। আটাশতম আয়াতে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে যে সব কুরাইশ কাফিররা মুসলমানদের অংকুরে সমূলে নষ্ট করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এ আয়াতটিতে বদর যুদ্ধের পরাজিত অংশের আলোচনা বিধৃত হয়েছে বিধায় বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এবং সহীহ বুখারী শরীফেও এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। অত্র সূরার ছত্রিশতম থেকে একচল্লিশতম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.), তাঁর পরিবার ও প্রিয় সন্তানদের আলোচনা, আল্লাহর নির্দেশের সামনে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে নির্বাসন দেয়া সহ নানা পরীক্ষার আলোচনা, অবশেষে আল্লাহর দরবারের রেখে যাওয়া সন্তানদের জন্যে প্রার্থনার আলোচনা স্থান পেয়েছে। অত্র সূরার একচল্লিশতম আয়াত থেকে শেষ অবধি আয়াত গুলোতে কিয়ামত দিবসের আলোচনা, আল্লাহর ওয়াদার ঘোষণা, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও মহাপরাক্রমশালী হওয়ার ঘোষণা, প্রত্যেক বান্দাকে তার যথাযথ প্রতিদান দেয়ার আলোচনা এবং সর্বশেষে হুশিয়ারী বার্তা আলোচিত হয়েছে। এভাবে এটা মানুষদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে জারিকৃত ফরমান। যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে, যে মহান আল্লাহ একক সত্তা, তিনিই একমাত্র উপাস্য, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। বিবেকসম্পন্নরা যেন এই উপদেশে গ্রহণ করে। আমীন।

খোদার কুদরতি ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্তগন

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন আলকাদেরী *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ . (البخاری، کتاب الذکواۃ، بال الصدقة باليمين- ١٩١١١)

অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নূরানী জবানে এরশাদ করেছেন- সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তায়ালা ঐদিন আপন কুদরতি ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন তার প্রদত্ত ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা। তাঁরা হলেন- (এক) ন্যায়পরায়ন ইমাম তথা নেতা, (দুই) যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহর এবাদতে কাটিয়ে দেয়, (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, (চার) যে ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহরই সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পর বন্ধুত্ব করে, পরস্পর মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়, (পাঁচ) যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত , সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি, (ছয়) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান-সদকা করে যে, ডান হাতের ব্যয় সম্পর্কে বাম হাত পর্যন্ত অবহিত থাকে না, (সাত) যে ব্যক্তি নিরালয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তার চক্ষুদ্বয় হতে পানি প্রবাহিত হয়। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯১, বাবুস সদকাহ বিল ইয়ামিন, কিতাবুয যাকাত)

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুদূর প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রাণ-প্রিয় নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামার উপরে বর্ণিত হাদীস শরীফের শিক্ষা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সীমাহীন। অত্র হাদীসে রহমতের নবী, ছাহেবে লাওলাক, ওয়াল মি'রাজ, সৃষ্টিজগতের মূল, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাধ্যম প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম সাত প্রকার লোকের মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে সম্মান ও মর্যাদা পরকালের ভয়াবহ অবস্থায় প্রাপ্য শান্তিদায়ক ছায়া ও আশ্রয় সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। নিম্নে প্রত্যেক শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া হলো,

প্রথমতঃ- ন্যায়পরায়ন ইমাম, বাদশাহ, বিচারক, সমাজপতি, নেতা বা মানব সমাজের পরিচালকের আসনে সমাসিন ব্যক্তিরা যদি ইনসাফ বা ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে স্বীয় অধিনস্তদের পরিচালনা করেন, সে সমাজ হবে শান্তি-শৃংখলা উন্নতি ও অগ্রগতির উজ্জ্বল উদাহরন। কিন্তু একজন নেতার পক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের উপর অটল থাকাটা অতি সহজ নয়। শত রকমের প্রলোভন ও বাধা ডিঙ্গিয়েও যখন নেতা দায়িত্বশীলতার সাথে সততা ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকেন, তখন নেতার অধীনে গোটা সমাজ হয়ে উঠে বসবাসের আদর্শ স্থান। প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন- তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতের অধিকারী হবে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো- ন্যায়পরায়ন শাসক যাকে ন্যায় বিচারের তাওফিক দেয়া হয়েছে। (মুসলিম শরীফ) তাইতো ফকীহগন একজন ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারককে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলেছেন এবং তাদের সম্মানার্থে

দাঁড়ানোসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে উত্তম বলে মত প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ- যে সকল যুবক আপন যৌবনকে আল্লাহর এবাদতে কাটিয়ে দিবে এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর ভয়ে নিয়ন্ত্রন রেখে এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে তাকেও মহান আল্লাহ কেয়ামতের ভয়াবহ তাপের প্রাক্কালে স্বীয় কুদরতি ছায়াতলে স্থান দিবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যৌবন কালে মানুষের গুনাহ, অন্যায় পথে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা, আশংকা ও ঝোঁক বেশী থাকে এবং প্রবৃত্তি থাকে জোরদার। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যবান মনে করো। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বার্ধ্যক্যের আগে যৌবনকে। তাই বার্ধক্যকালীন এবাদতের তুলনায় যৌবনের এবাদত অনেক বেশী উত্তম।

তৃতীয়তঃ- যে লোকের অন্তর সদা সর্বদা আল্লাহর ঘর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে অর্থাৎ নামাজের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং মসজিদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে, এমন ব্যক্তিকে উল্লেখিত সম্মান প্রদান করা হবে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে মসজিদ ছাড়া সমস্ত পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে। আর এই মসজিদ সমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে এক স্থানে অবস্থান করবে। (তিবরানী শরীফ, কানজুল উম্মাহ) সাহাবী আবু সাইদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত নবীয়ে পাক (সঃ)এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখবে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে ভালবাসা রাখবে। (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী (রাঃ) আরো বর্ণিত আছে, রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে বলবেন আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেস্তারা বলবেন, আপনার প্রতিবেশী কারা? আল্লাহ তাআলা বলবেন, মসজিদ সমূহকে আবাদকারীরা হচ্ছে আমার প্রতিবেশী। (হুলিয়াতুল আউলিয়া) সুতরাং এ স্থানের সাথে সম্পর্কিতদের জন্য পরকালের ভয়াবহ সময়ে আল্লাহ তাআলা আশ্রয় দিয়ে তার প্রশান্তি নিশ্চিত করবেন। যারা নিয়মিত মসজিদে নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত তাদেরকে এই দুনিয়াতেও জান্নাতি রিযিক দেয়া হবে বলে অন্য হাদীসে সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ- ঐ ধরনের দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহরই পথে পরস্পর বন্ধুত্ব করে তাদের একত্রিত এবং বিচ্ছিন্ন উভয়টা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদের সাক্ষাত, বিচ্ছেদ, বন্ধুত্ব সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। তাইতো কোন অমুসলিম বেদীন, বদ আমলকারী সন্তান ও আত্মীয় এবং বদ আকীদার লোকদের প্রতি ঘৃণা যেভাবে এবাদত ঠিক তেমনি ভাবে মুত্তাকি আলেম পীর মাশায়েখ অলী আল্লাহদের সাথে অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ভালবাসা আন্তরিকতা রাখা এবাদত। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা এবং ঘৃণা করা। অতএব মহান আল্লাহর রেজামন্দির জন্য যে দুজন লোক একে অপরকে ভালবাসবে, একত্র হবে অথবা বিচ্ছিন্ন হবে তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবে।

পঞ্চমতঃ- যে ব্যক্তি কোন লোভনীয়, সুন্দরী ও উচ্চ বংশীয় নারী অবৈধ সংসর্গের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তা প্রত্যাখান করে। তাকেও কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহ আশ্রয় দিবেন। প্রিয়নবী (দঃ) এর এরশাদ হচ্ছে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ নেক আমলের উসিলায় বিপদ মুক্ত করেন। তন্মধ্যে একজন হলো- যে আপন চাচাত বোনকে নির্জনে পেয়েও আল্লাহর ভয়ে ব্যবিচার করে নাই। (মিশকাত-৪২০) সাধারণত পুরুষ নারীর প্রতি ধাবিত হয় এবং নারী হচ্ছে লোভনীয় বস্তু। নারীভোগের লিপ্সা যে কোন পুরুষের স্বভাব যা অগ্রাহ্য করা খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও কোন রূপসী, সম্ভ্রান্ত নারীর আহ্বান প্রত্যাখান করে যে পুরুষ আল্লাহ ভীরুতা প্রদর্শন

করতে পারে তাকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ভয়াবহ রৌদ্রতাপ হতে রক্ষা করবেন।

ষষ্ঠতঃ- যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে দান-খয়রাত করে। অবশ্য কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্যে সদকা করাও ভালো। তবে গোপনে দান-সদকা করাই উত্তম। সদকা করার দ্বারা বিপদ আপদ দূর হয়। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে কৃপণ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন হে আদম সন্তানেরা তুমি তোমার সম্পদ ব্যয় কর। আমি এর বিনিময় প্রদান করব। দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহতাআলা ভালবাসেন। কৃপনকে ঘৃণা করেন। তাই এ ধরনের দানশীল ব্যক্তির জন্যও আল্লাহর আশ্রয় রয়েছে।

সপ্তমতঃ- যে ব্যক্তি একাকী বা নির্জনে বসে বসে আল্লাহর স্বরণে চোখের পানিতে বুক ভাসায়, যার মধ্যে লোক দেখানো কৃত্রিমতা বিন্দুমাত্র নেই, সদা সর্বদা প্রিয়নবীর (দঃ) মোহাব্বত, ভালোবাসা আর খোদা তাআলার ভয় যার অন্তরকে পূর্ণরূপে সিক্ত রাখে। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব গজব লানত এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা ভেবে যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে এবং চোখের পানিতে বুক ভাসায় তারাই প্রকৃত মুমিন এবং তাদের জন্যই পরকালে তাদের রবের কাছে রয়েছে আশ্রয় এবং নিরাপত্তার সুসংবাদ। কেননা মওলার দরবারে চোখের পানি বড়ই মূল্যবান।

অতএব, আমরা যদি এ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ার চেষ্টা করি তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উভয় ক্ষেত্রে জাগতিক ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করতে পারবো। হে আল্লাহ! প্রিয় নবী (দঃ) এর উসিলায় তাওফিক দান করুন। আমিন

লেখক:
ফকিহ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল এম এ মাদ্রাসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-রেজা
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (উন্নয়ন)

পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
আল-বারাকাহ্ ইসলামী বীমা ও ডি.পি.এস

আপনার ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা এবং ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আজই একটি বীমা পলিসি গ্রহণ করুন।

আপনার কর্মস্থল ও লেখাপড়ার পাশাপাশি পার্ট টাইমে চাকরী করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পুরুষ ও মহিলারা প্রতি শনিবার সকাল ১০টায় যোগাযোগ করুন।

ঠিকানা
কোম্পানীর নিজস্ব ফ্লোর, শেখ জোহরা টাওয়ার (৫ম তলা), আগ্রাবাদ, ১৪০২, চৌমুহী, চট্টগ্রাম।
E-mail : mdabdullahallreza@gmail.com, FAZ : 031-2525389
Mobile : 01752-975233, 01818-092424

যে কোন প্রকারের ইনজেকশান রোযা ভঙ্গকারী

অনুবাদ: মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন নোমানী *
মূল: আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী রহ:

ইনজেকশান এক নতুন আবিষ্কার। এটা ঔষধ হিসেবে কাজ করে এবং গ্লুকোজ হিসেবে খাদ্যের কাজ করে। বহু আলেমগণের অভিমত এই যে, যেকোন প্রকারের ইনজেকশান চাই সেটা ঔষধের, শারীরিক শক্তির অথবা গ্লুকোজের ড্রপ অথবা যে কোন প্রকারের শক্তি বর্ধক, যেভাবেই দেয়া হোক না কেন তা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা তাঁদের মতে ঔষধ এবং খাবার যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলির ভেতরে অথবা মগজের ভেতরে প্রবেশ করবে না, রোযা ভাংগবে না। তাঁদের ধারণা এই যে পাকস্থলি এবং মগজের মাঝখানে একটি সংযোগ নালী রয়েছে, যার মাধ্যমে মগজ থেকে পাকস্থলিতে খাবার অথবা ঔষধ স্থানান্তরিত হয়। এই মাসআলায় আমাদের অভিমত এই যে, ঔষধ গ্লুকোজ অথবা যে কোন প্রকারের ইনজেকশান দেয়ার ফলে রোযা ভঙ্গ হবে। কারণ খাদ্য হজমের স্তরগুলো অতিক্রম করে গ্লুকোজে পরিণত হয়। অতপর তা আমাদের শরীরে শক্তি যোগায়। অতএব মুখ পথের মাধ্যমে খাদ্য গ্লুকোজ হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এর ফলে রোযা ভঙ্গ হয়। আর যদি প্রত্যক্ষভাবে গ্লুকোজ, ইনজেকশান অথবা ড্রপের মাধ্যমে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, এর মাধ্যমেও রোযা ভঙ্গ হবে। মুখ দিয়ে যখন ঔষধ গ্রহণ করা হয়, তা হজম হওয়ার পর আমাদের রক্তে মিশে যায়। এর ফলে রোযা ভঙ্গ হয়। অনুরূপভাবে ঔষধ যদি প্রত্যক্ষভাবে ইনজেকশানের মাধ্যমে রক্তে পৌছিয়ে দেয়া হয়। এর ফলেও রোযা ভঙ্গ হবে। ইনজেকশানের মাধ্যমে ঔষধ রক্তের মধ্যে পৌছানোর ফলে কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা আরো দ্রুত ও অধিকহারে ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং ইনজেকশানের মাধ্যমে রোযা আরো ভালভাবেই ভঙ্গ হবে। যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা কোন কঠিন ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ইসলামী শরীয়ত তাকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি দিয়েছে। বরং ঐ সময় তার উপর রোযা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। কারণ তার শরীর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য আমানত স্বরূপ। এ শরীরকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ করার এ অধিকার তার নেই। সুতরাং চিকিৎসক তাকে ইনজেকশনে দিলেন অথবা খাবার ঔষধ দিলেন তখন চিকিৎসকের নির্দেশনা মান্য করে চিকিৎসা গ্রহণ করা তার ওপর কর্তব্য। এ পন্থায় সুস্থ হওয়ার পর তাকে ঐ রোযা কাযা করতে হবে। কাফফারা নয়। এ পর্যায়ে আমি প্রথমে রোযার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের বর্ণনা দেব। অতপর রোযা ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করব। অতপর যুক্তি, দলীল, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা দেব যে, ইনজেকশানের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হয়। অতপর সহীহ হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করব। অতপর ফোকাহায়ে কেরামের বর্ণনাকৃত আলোচনা থেকে দলীল পেশ করব। অতপর পেট, পাকস্থলি, মগজ, মূত্রনালীর পর্দা সম্পর্কে আলোচনা করব। অতপর ইনজেকশান গ্রহণ করলে রোযা ভাংগবেনা মর্মে যারা অভিমত দিয়েছেন তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করব এবং পরিশেষে এ আলোচনা করব যে, যদি কোন রোযাদার ব্যক্তির রোযা অবস্থায় কঠিন ব্যাথা কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসার স্বার্থে রোযা ভঙ্গ করা তার ওপর ওয়াজিব। তখন রোযা ভঙ্গ না করাটা তাকওয়া ও পরহেজগারী নয়। বরং ঐ সময় রোযা ভঙ্গ না করাটা কঠিন গুনাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য বিধানের শামিল। ঐ ওজরের কারণে রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না বরং সুস্থ হওয়ার পর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযার শাব্দিক ও পরিভাষিক পরিচয়: আল্লামা ইবনে মানযুর আফ্রিকী বলেন,- الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام
অর্থাৎ-খাবার পানীয়, সহবাস এবং কথা বার্তা থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

(১. আল্লামা জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুকাররম ইবনে মানযুর আফ্রিকী, মৃত্যু ৭১১ হিজরী, লিসানুল আরব, ১২তম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫০, নশরু আদাবিল হাউযা, কুম ইরান ১৪০৫ হি.)

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে এসেছে,-

أما تفسيره فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس بنية التقرب من الأهل كذا في الكافي

(২. মোল্লা নিজাম উদ্দীন হানাফী, মৃত্যু ১১৬১হি: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, প্রথম খণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, মিশর ১৩১০।)

রোযার পরিভাষাগত পরিচিতি হচ্ছে এই, রোযা রাখার উপযুক্ত ব্যক্তি সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে খাবার, পানীয় গ্রহণ এবং সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

আল্লামা হাছকফী হানাফি বলেন, রোযা রাখার উপযুক্ত বলতে, মুসলমান হওয়া এবং হায়েজ নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া উদ্দেশ্য। বিবেকসম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং সুস্থ থাকা রোযার উপযুক্ততার জন্য শর্ত নয়। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল এবং রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রোযাও বিশুদ্ধ হয়।

রোযা ভঙ্গের কারণ সমূহ

কিছু কারণ আছে এমন যেগুলোর কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। আর কিছু কারণ আছে এমন যেগুলোর কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। এক্ষেত্রে নীতিমালা হচ্ছে এই, যে সব বস্তু আকৃতিগত এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে রোযাকে ভঙ্গকারী হয়। যেমন মুখ দিয়ে শরীরে কোন ঔষধ অথবা খাদ্য পৌঁছানো, অথবা কোন নারীর সাথে মিলন করা। এর ফলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে। আর যে সব বস্তু দ্বারা আকৃতিগত বা বাহ্যিক দিক থেকে ভঙ্গকারী হয়, মৌলিক বা আভ্যন্তরীণভাবে ভঙ্গকারী নয় এসবে ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যেমন-কাগজ, মাটি, কংকর, লোহার টুকরা, প্লাস্টিকের দানা ইত্যাদি খেয়ে ফেললে। আর যেসব বস্তু শুধুমাত্র মৌলিক বা আভ্যন্তরীণভাবে রোযা ভঙ্গকারী হয়, তবে আকৃতিগতভাবে রোযা ভঙ্গকারী নয়। যেমন কানের মধ্যে তেল অথবা ঔষধ দেয়া, কারণ এর মাধ্যমে শরীরের সুস্থতা অর্জিত হয়। এ প্রসংগে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,-

فَأَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ فَيَتَعَلَّقُ بِفَسَادِهِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ . أَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْإِفْسَادِ سَوَاءٌ كَانَ صُورَةً وَمَعْنًى أَوْ صُورَةً لَا مَعْنًى أَوْ مَعْنًى لَا صُورَةً وَسَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَسَوَاءٌ كَانَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ جَبْرًا لِلْفَائِتِ فَيَسْتَدْعِي فَوَاتَ الصَّوْمِ لَا غَيْرَ وَالْفَوَاتُ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ الْإِفْسَادِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْجَبْرِ بِالْقَضَاءِ لِيَقُومَ مَقَامَ الْفَائِتِ فَيَنْجَبِرُ الْفَوَاتُ مَعْنًى وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْإِفْطَارُ الْكَامِلُ بِوُجُودِ الْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مُبِيحٍ وَلَا مُرَخِّصٍ وَلَا شُبْهَةِ الْإِبَاحَةِ وَنَعْنِي بِصُورَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَعْنَاهُمَا إِيصَالَ مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغَذِّي أَوِ التَّدَاوِي إِلَى جَوْفِهِ مِنَ الْفَمِ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ قَضَاءُ شَهْوَةِ الْبَطْنِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ وَنَعْنِي بِصُورَةِ الْجِمَاعِ وَمَعْنَاهُ إِيلَاجَ الْفَرْجِ فِي الْقُبُلِ لِأَنَّ كَمَالَ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْفَرْجِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالْجِمَاعِ

(২. আল্লামা আবু বকর বিন মাসউদ কাসানী হানাফী, মৃত্যু ৫৮৭ হি. বাদাইউস সুনায়ে, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮, এইচ এম সাঈদ এণ্ড কোম্পানী ১৪০০ হিজরী।)

রোযা ভঙ্গের সাথে দুটি হুকুম সম্পৃক্ত হয়। একটি হল কাযা ওয়াজিব হওয়া এবং অন্যটি হল কাফফারা ওয়াজিব হওয়া। রোযা ভঙ্গ হলে সাধারণত কাযা ওয়াজিব হয়। হোক আকৃতিগত দিক থেকে অথবা মৌলিকভাবে, অথবা শুধুমাত্র আকৃতিগতভাবে অথবা শুধুমাত্র মৌলিকভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে, ওজরের কারণে অথবা ওজর ব্যতিরেকে। কারণ কাযা কোন ছুটে যাওয়া বিষয়ে পূর্ণতা দানের জন্য ওয়াজিব হয়। একারণে যে, কাযার জন্য রোযা ছুটে যাওয়াটাই যথেষ্ট। আর রোযা ছুটে যায় রোজা ভঙ্গ হওয়ার মাধ্যমে। আর কাফফারা ওয়াজিব হয় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রোযা ভঙ্গ হলে। আর সেটা সংঘটিত হয় افطار كامل তথা পূর্ণাঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। অর্থাৎ খাওয়া, পান করা, মিলন করা আকৃতিগত থেকে এবং মৌলিকভাবে (صورة معنى) উভয় দিকে থেকে হওয়া ইচ্ছাকৃত হওয়া, ওজর বিহীন হওয়া, রোযা ভঙ্গ করার বৈধ কারণ (সফর, রোগব্যাধি) না থাকা, বৈধতার সংশয়পূর্ণ না হওয়া। বাহ্যিক এবং মৌলিকভাবে (صورة-معنى) ভঙ্গকারী দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, মুখ গহবর দিয়ে পেটের মধ্যে এমন বস্তু পৌঁছিয়ে দেয়া, যা দ্বারা ঔষধ অথবা খাদ্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কারণ এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পেটের চাহিদা অর্জিত হয়। আর আকৃতিগত দিকে থেকে এবং মৌলিক (معنى) দিক থেকে সঙ্গম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষ তার যৌনাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনিতে প্রবেশ করানো। কারণ এর মাধ্যমেই যৌনাঙ্গের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়। আর এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। (নারী-পুরুষ উভয়ের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।)

আল্লামা আল মরগিনানী হানাফী লিখেছেন-

وَلَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُمَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ لِانْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْخَلَهُ الدُّهْنَ .

(৩. আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন আবি বকর আল মরগিনানী হানাফী ৫৯৩ হি. হেদায়া প্রথম খণ্ড। করাচি।

অর্থাৎ- রোযাদার যদি নিজে কানের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়েছে অথবা পানি রোযাদারের অনিচ্ছা সত্যেও) প্রবেশ করেছে, তাহলে তার রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ এটা আকৃতিগত (صورة) পন্থায় ভঙ্গকারী নয়। (যেহেতু মুখ দিয়ে পান করেনি) এবং মৌলিক (معنى) ভাবেওএটা ভঙ্গকারী নয় (কারণ দুই এক ফোটা পানি দিয়ে শরীর সুস্থ হয় না)। তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে কানের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তেল প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এর ব্যাখ্যায় বলেন,- يعنى افطر اذا ادخل فى اذنيه الدهن لوجود صلاح البدن অর্থাৎ রোযাদার যদি কানের মধ্যে তেল প্রবেশ করায় তাহলে, এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে। কারণ এর মাধ্যমে শরীর উপকৃত হয়।

আল্লামা মরগিনানী আরো উল্লেখ করেন,-

ومن ابتلع الحصاة او الحديد افطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعنى .

(৫.) প্রাগুক্ত

(৬.) আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ৮৫৫ হি. বেনায়াহ, ২য় খণ্ড, ১৩০৯ নং পৃষ্ঠা, মুলকে সনজ, ফয়সাল আবাদ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোহা অথবা কংকর গিলে ফেলল, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ এ আমল আকৃতিগত (صورة) দিক থেকে রোযা ভঙ্গকারী। তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ এ কাজটি মৌলিকভাবে (معنى) রোযা ভঙ্গকারী নয়। (যেহেতু এগুলো খাদ্যও নয়, ঔষুধও নয়)।

আল্লামা কাসানী বলেন,

ولو انزل فيما دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه لقصور فى الجماع لوجوده معنى ولا صورة .

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি (তার স্ত্রীর/ যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বির্যপাত ঘটায়, তাহলে তার ওপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা নয়। কারণ এটা অসম্পূর্ণ মিলন। যা (معنى) মৌলিকভাবে মিলন তবে বাহ্যিকভাবে (صورة) নয় বিধায়।

ইনজেকশান নেয়ার ফলে রোযা ভঙ্গ হওয়ার যৌক্তিক এবং বাস্তব দলীলঃ

আমরা সাধারণত যেসব ফল-ফলাদি, শাক-সবজি, মাছ মাংসে এবং চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকি, সেখানে বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন (VITAMINs) এবং খনিজ কণিকা (MINERALS) রয়েছে। ভিটামিনের ফলে খাবারগুলো পরিপূর্ণভাবে হজম হয়ে শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গে পৌঁছে যায়। মানব দেহের বৃদ্ধি পাওয়া, দেহের সুরক্ষা এবং সৌন্দর্য রক্ষার্থে ভিটামিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপভাবে খনিজ কনাও মানব দেহের সুস্থতা এবং অস্থিত্ব রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা রাখে। রক্ত স্বল্পতা দূর করতে IRON এর প্রয়োজন হয়, হাঁড় এবং শিরা উপশিরা সচল রাখতে কেলসিয়ামের প্রয়োজন হয়, ব্লাড প্রেসার অনুকূলে রাখতে সোডিয়ামের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পল জি ফ্রাইডম্যান এমডি (Paul Jay Friedman MD) বলেন, ১। ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে এবং ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষার্থে কাজ করে।

২। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (V.B Complex) শরীরের গঠন বৃদ্ধির কাজে ভূমিকা রাখে। এর অভাবে শিরা উপশিরা, ত্বক এবং হজম শক্তি যথাযথ কাজ করে না। এমনকি রক্তশূন্যতা (ANEMIA) দেখা দেয়।

৩। ভিটামিন সি (ASCORBIC ACID) শরীরে শক্তি যোগায়। এর অভাবে দাঁতের মাড়ির রোগ ব্যধি হয়।

৪। ভিটামিন ডি (D.V) শরীরে কেলসিয়াম তৈরীতে সহায়তা করে।

৫। ভিটামিন ই (V.E.) শরীরে চর্বিকে কাজে লাগাতে সহায়তা করে। এর অভাবে রক্ত স্বল্পতা তৈরী হয়। সন্তেজতাব কমে যায় এবং তরুনু স্বল্পতা তৈরী হয়।

৬। ভিটামিন কে (V.K) এর অভাবে রক্তে চলাচল ব্যাহত হয়।

(৮. পল জি ফ্রইডম্যান এম ডি বায়োকেমিস্ট্রি, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮ পিটিজিয়াস, বারগুম।)

এ সকল ভিটামিন, খনিজকণা বিভিন্ন ফল-মূল, শাক সবজি, মাছ-মাংসের মধ্যে বিদ্যমান। কোন কোন সময় খাদ্য পরিপূর্ণভাবে হজম হয় না। ফলে শরীরের মধ্যে ভিটামিন তৈরী হয় না। অথবা কম পরিমাণ তৈরী হয়। ভিটামিন স্বল্পতার কারণে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়। আগেকার যুগে এ বিষয়ের সহজত সমাধান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সকল প্রকার ভিটামিন এবং খনিজ পর্কো তৈরী করা হচ্ছে। যে কারো ভিটামিন অথবা মিনারেল প্রয়োজন হলে প্রতিদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তৈরী ভিটামিন ও মিনারেল ঐ খাদ্যের সাথে প্রদান করা হচ্ছে। আর যদি কোন ব্যক্তির হজমী শক্তি নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা খুবই দ্রুত ভিটামিনের প্রয়োজন হয়, তাহলে এসব ভিটামিন এবং মিনারেল ইনজেকশন অথবা ড্রপের মাধ্যমে তার শরীরে প্রদান করা হয়। এমনিভাবে খাদ্য চক্রের স্বভাব একই। আমরা যা কিছু খাই, তা হজমের স্তরগুলো অতিক্রম করে গ্লুকোজে পরিণত হয়। আর যদি ইনজেকশানের মাধ্যমে অথবা ড্রপের মাধ্যমে সরাসরি গ্লুকোজ শরীরে প্রদান করা হয়, তাহলে গ্লুকোজের প্রয়োজনীয়তা পুরন হয়। গ্লুকোজ সরাসরি প্রচলিত কোন খাদ্য নয়। তবে এটা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাদ্যের পরিপূরক বিকল্প হিসেবে কাজ করে। যখন কোন মানুষের পেটের অপারেশন অথবা বড় কোন অপারেশন করা হয়। তখন তার পাকস্থলীকে খালি করা হয়। কোন কোন সময় এমন হয় যে দশ পনের দিন অপারেশন হয় না। এ সময় তার পাকস্থলীকে খালি রাখা হয়। শুধু মাত্র ড্রপের মাধ্যমে তাকে গ্লুকোজ খাওয়ানো হয়। মোদ্দা কথা ইনজেকশানের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে ঔষধ, খাদ্য (গ্লুকোজ) প্রবেশ করানো হয়। ঐ ইনজেকশান রগের মধ্যে দেয়া হোক অথবা মাংশপেশীতে দেয়া হোক, উভয় অবস্থায় শরীরের সুস্থতা এবং উপকারিতা অর্জিত হয়। আর প্রত্যেক ঐ বস্তু যা প্রবেশ করার ফলে মানব দেহের সুস্থতা অথবা উপকারিতা অর্জিত হয়, তা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে ইনজেকশান অথবা ড্রপের মাধ্যমে ঔষধ অথবা গ্লুকোজ শরীরের ভেতর প্রবেশ করালে রোযাদারের ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আগেকার যুগে ইনজেকশান বা ড্রপের মাধ্যমে মানবদেহে খাদ্য কিংবা ঔষধ পৌঁছানোর ধারণা জানা ছিলনা। তখনকার সময়ে শুধুমাত্র মুখের ভেতর দিয়ে এবং নাকের ভেতর দিয়ে ঔষধ, খাদ্য শরীরের ভেতর প্রবেশ করানো হতো। এ কারণে তখনকার ফকিহগণ এ পদ্ধতিতে শরীরে ঔষধ ও খাদ্য

পৌঁছানোকে রোযা ভঙ্গের কারণ হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ঔষধ ও খাদ্য পাকস্থলীর ভেতরে প্রবেশ করার শর্তারোপ করেছেন নিজেদের গবেষণা সাপেক্ষে। কারণ ঔষধ ও খাদ্য যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলীতে পৌঁছে হজমের প্রক্রিয়া অতিক্রম করে রক্তে পৌঁছে যায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তা দ্বারা শরীরের পুষ্টতা কিংবা উপকারিতা অর্জিত হতোনা। কিন্তু আজকাল যেহেতু, ঔষধ এবং খাদ্য পাকস্থলীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রক্তে পৌঁছে যাচ্ছে। সুতরাং এ প্রক্রিয়ায় আরো ভালোভাবে রোযা ভঙ্গ হবে।

ইনজেকশান গ্রহণের ফলে রোযা ভঙ্গ হওয়ার ওপর হাদীসের দলীল ঃ

এ বিষয়টা স্মরণ রাখা দরকার যে, খাদ্য এবং ঔষধ পেটের ভেতরে অথবা মগজে প্রবেশ করার এই শর্তারোপ করেছেন ফকীহগণ নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে। তবে হাদীসগুলোতে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই সাধারণভাবে বলা হয়েছে الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে। বিষয়টি ব্যাপক। শরীরের যে কোন অংশে প্রবেশ করুক না কেন। তবে শরীয়ত প্রণেতা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের যে সব অঙ্গগুলোকে পৃথক করে নিয়েছেন, তা ব্যতিরেকে, যেমন চোখে সুরমা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন, (চোখে ঔষধ লাগানো এর উপর কিয়াস করা হয়েছে), মিসওয়াক করা, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এগুলো ছাড়া শরীরের যেকোন অঙ্গে যে কোন প্রক্রিয়ায় ঔষধ অথবা খাদ্য প্রবেশ করলে হাদীসের আলোকে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিম্নে সেসব হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হল। হাফেজ আলহাইছামী বলেন,-

[illegible]

৯. হাফেজ নূরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর আলহাইছামী, ৮০৭ হি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭, দারুল কিতাবিল আরবী বৈরুত।

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন,. অতঃপর বললেন, হে আয়েশা! রুটির কোন টুকরা আছে কি? আমি তাঁর নিকট রুটির একটা টুকরা নিয়ে এলেছি। তিনি এটা মুখের মধ্যে রেখে বললেন, হে আয়েশা! বলো, এর ফলে আমার পেটের মধ্যে কোন কিছু প্রবেশ করেছে কি? একই হুকুম রোযাদার ব্যক্তির চুমু দেয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রোযা শুধুমাত্র কোন কিছু প্রবেশ করাতে ভঙ্গ হয়, বের হলে নয়।

ইমাম বুখারী (রা.) বর্ণনা করেন,

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

১০. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, ২৫৬ হি. সহীহ বুখারী ১ম খন্ড, প্রকাশনা নূর মোহাম্মদ করাচি।

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইকরামা (রা.) বর্ণণা করেন, রোযা কোন কিছু প্রবেশ করলে ভঙ্গ হয়, বের হলে নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস এর এই হাদীসকে ইমাম ইবনে অবিশাইবা, ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম আব্দুর রাযযাক (রা.) বর্ণনা করেছেন

عن عبد الله بن مسعود قال- انما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج

১১. ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন অবিশাইবা ২৩৫ হি মুসান্নাফ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১, এদারাতুল কুরআন, করাচি।

অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ওযু ভঙ্গ হওয়া ঐ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যা শরীর থেকে বের হয়। আর রোযা ভঙ্গ হওয়া ঐ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, ঐ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় যা বের হয়।

(চলবে)

"সত্যানুসন্ধানী মানুষের প্রিয় পত্রিকা মাসিক ঈমানের আলো"
এম. মহিউল আলম চৌধুরী
পরিচালক
মুন্নু সিরামিক, শাইন পুকুর সিরামিক
প্যারাগন সিরামিক, প্রতিক সিরামিক
ফার সিরামিক
মেসার্স আয়াত ট্রেডার্স
এখানে হোটেল, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, ডেকোরেশন, কনভেনশন হল, কমিউনিটি সেন্টার, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন অফিসে ব্যবহৃত ভাতের ডিস, ভাতের প্লেট, নাস্তার প্লেট, বাটি, কপি মগ, কাপ-পিরিচসহ ব্যবহৃত সিরামিকের উপর মনোগ্রাম দিয়ে ও মনোগ্রাম ছাড়া অর্ডার নেয়া এবং ডেলিভারী দেয়া হয়।
সিরামিকের ডিনার সেট, টি সেট সহ বিভিন্ন গিফট আইটেম পাকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়
E-Mail : mohiulalam.ceramic@gmail.com
৯নং ব্যাপটিস্ট মিশন রোড, ফিরিঙ্গী বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৯-৬৬৪৩৬৭, ০১৭১৭-৬৬৪৩৬৭, ফোন : ২৮৬৯৪০২

মি'রাজের বাস্তবতা, তাৎপর্য ও সার্থকতা

অধ্যাপক মোহাম্মদ এমদাদুল হক *

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চার হাজার মোজেজার মধ্যে একটি হচ্ছে মি'রাজ। মি'রাজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে তা কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন তা শারীরিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক, কেহ বলেন স্বাপ্নিক। এরূপ মতভেদে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের মধ্যে সংঘটিত এমন একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে যে নানা লোক নানাভাবে ব্যাখ্যা করবে এটাইতো স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ যখন তার আয়ত্তের বহির্ভূত কোন বিষয়বস্তু বুঝার চেষ্টা করে, তখন এই দশাই ঘটে।

এবার আসা যাক মি'রাজ কি?

মি'রাজ শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বগমন। মক্কা শরীফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাস (ফিলিস্তিন) এবং বায়তুল মোকাদ্দাস হতে ঊর্ধ্বগমন, সপ্ত আকাশ ভ্রমন, নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ, বেহেশত-দোযখ দর্শন এবং ছিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত গমন এবং ছিদরাতুল মোন্তাহা থেকে রফরফের মাধ্যমে আরশে আযীমে গমন, সেখান থেকে লা-মাকান ভ্রমণ এবং আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য লাভ। সেখান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে (মক্কায়) আগমন। এই দীর্ঘ সফরকে এক নামে মি'রাজ বলা হয়।

এই দূর্লভ ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা শরীফ থেকে ২৭ শে রজব রাতের সামান্য সময়ে।

মি'রাজকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

প্রথম পর্যায় ঃ উম্মেহানীর ঘর থেকে কা'বা শরীফের আঙ্গীনায়, সেখান থেকে বোরাকে আরোহন করে ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে উর্ধ্বেগমন, সপ্ত আকাশ ভ্রমন, নবীগণের সাক্ষাৎ এবং ছিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত ভ্রমণ।

তৃতীয় পর্যায় ঃ আরশে আযীম, লা-মাকান (অসীমের দূরত্ব পাড়ি) ভ্রমণ এবং আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য লাভ। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আল্লাহ তা'আলাকে তিনি শুধু অন্তর দ্বারা অনুভব করেননি, বরং চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগও লাভ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সহ সকল বিজ্ঞ সাহাবী ও ইমামদের এটাই অভিমত।

মি'রাজের বাস্তবতা ঃ

প্রশ্ন আসে রাতের একটা সামান্যতম অংশে একজন জড়দেহী মানুষের পক্ষে মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস, সেখান থেকে সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে ছিদরাতুল মোন্তাহা তার উপরে ৩৬ হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে আরশে গমন এবং সেখান থেকে ৭০ হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে (এক পর্দা হতে অপর পর্দার দূরত্ব পাঁচ শত বছরের রাস্তা) একেবারে নির্জনে দীদারে এলাহীতে পৌঁছা কি করে সম্ভব? সেখানে আল্লাহর সাথে ৯০ হাজার বাক্যবিনিময় এবং পুনরায় মক্কায় উপস্থিত হওয়া কি করে সম্ভব?

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায় মি'রাজ ছিল বাস্তব সত্য ঘটনা। এটা ছিল শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক অথবা স্বাপ্নিক নয়।

মি'রাজের বাস্তবতা প্রমানের সাক্ষ্যসমূহ ঃ

প্রথম সাক্ষী ঃ মহান আল্লাহ ও পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে মি'রাজের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সূরা নজমের প্রথম থেকে ১৭নং আয়াতে মি'রাজের তৃতীয় পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সাক্ষী ঃ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁর হাদীস শরীফ। ৩০ জন সাহাবীর মোতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবতা প্রমাণিত।

তৃতীয় সাক্ষী ঃ স্বয়ং জিব্রাঈল (আঃ) ও সকল ফেরেশতাগণ।

চতুর্থ সাক্ষী ঃ খলীফাতুর রাসূল হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত উম্মেহানী (রাঃ)।

পঞ্চম সাক্ষী ঃ বিজ্ঞান।

পাঠক মহলের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বাক্ষীর জন্য ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (আ'লা হযরত) প্রণীত কুরআনুল কারীমের তাফসীর গ্রন্থ কানযুল ঈমান দেখার জন্য।

তৃতীয় স্বাক্ষীর জন্য বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে জালালাইন শরীফের ২২৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

চতুর্থ স্বাক্ষীর জন্য মাওয়াহেবে লাদুনিয়া গ্রন্থখানা পাঠ করতে পারেন। যেহেতু প্রথম থেকে চতুর্থ স্বাক্ষী সরাসরি কোরআন ও হাদীস সংশ্লিষ্ট এবং ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষ, সেহেতু এই ছোট প্রবন্ধে বিস্তর আলোচনা করা সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে তাই শুধু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মে'রাজ বিষটি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

মি'রাজ ও মধ্যাকর্ষণ ঃ

মধ্যাকর্ষণ শক্তির মূল কথা হচ্ছে : পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। কাজেই যুক্তিবাদিরা বলেন নবী করীম (দঃ) এর স্ব শরীরে আকাশ ভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে, মধ্যাকর্ষণ নীতির দোহাই দিয়ে তাঁরা মে'রাজকে অস্বীকার করতেন সে নীতিকে আজ বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যাখ্যান করছেন। শুণ্যে অবস্থিত কোন স্থুলবস্তুকে পথিবী যে সব সময় সমভাবে আকর্ষণ করতে পারেনা, আজ তা পরীক্ষিত সত্য। গতি বিজ্ঞান স্থির করেছে যে, "A bullet fired from the earths surface with a speed of 6.90 miles a second or more will fly into space". (The Universe Around us. by J.Jeans P-216) অর্থাৎ পৃথিবী হতে কোন বস্তুকে যদি প্রতি সেকেন্ডে ৬.৯০ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুঁড়ে দেয়া হয় তবে তা আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে না।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুটতে পারলে পৃথিবী হতে মুক্তিলাভ করা যায়। একে মুক্তগতি (Escape Velocity) বলে। "This velocity-is 25,000 m.p.h. and is called the velocity." গতিবিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের ফলেই মানুষ এখন চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে সফল অভিযান পরিচালনা করছে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যাকর্ষণের যুক্তি দ্বারা মি'রাজের বাস্তবতাকে নিবারিত করা যাচ্ছে না।

মি'রাজ ও সময়ের প্রশ্ন ঃ

মি'রাজ সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করেন, তাদের নিকট সময়ের প্রশ্নও একটা বড় যুক্তি। কারণ নবীজী যখন বোরাকে চড়ে রওয়ানা হন, তখন তাঁর অজু করবার স্থান থেকে অজুর পানি যেরূপে গড়িয়ে যেতে দেখেছিলেন ফিরে এসে ঠিক সেরূপে গড়িয়ে যেতে দেখেছিলেন। নিমিষের মধ্যে কি করে এত বড় কাণ্ড ঘটল? তা-ই হচ্ছে সন্দেহবাদীদের প্রশ্ন। কিন্তু যে বিজ্ঞানের কথা বলে তারা মি'রাজ অবিশ্বাস করেন সে বিজ্ঞানই ত বলছে যে, সময়ের স্থিরতা কিছুই নাই, এটা আমাদের মনের খেয়াল মাত্র। আল্লাহর ঘড়ির সঙ্গে আমাদের ঘড়ি মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই যে ঘড়ি আমাদের একান্তই মনগড়া এবং যার কোন মূল্য নাই , তা নিয়ে মি'রাজের সময় নির্ণয় করতে যাওয়া আমাদের খুবই অন্যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ত পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন ঃ স্বভাবের প্রকৃত সময় (true time of nature) আজও তাঁরা জানে না। কাজেই সময়ের প্রশ্ন মোটেই এখানে যুক্তিযুক্ত নয়। স্থান, কাল এবং গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে। সে সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় মি'রাজের ন্যায় দুর্বোধ্য ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না। যেমনঃ দর্শকের গতির তারতম্যে বস্তু বা ঘটনার স্থান-নির্ণয়ে তারতম্য ঘটে। আবার একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দুটি ঘটনা দর্শকের গতির তারতম্যে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে হবে। এবং গতির উপর থাকলে সময় অস্বাভাবিকরূপে খাটো হয়ে যায়।

"Suppose you decided to visit one of the satellites of Sirius which is at a distance of nine light-year from the solar system, and use for your trip a rocket ship that can move practically with the trip to Sirius and back would take you at least eighteen years and you would be inclined to take with you a very large food supply. That precaution, however, would be also

lutely unnecessary if the mechanism of your rocket-ship made it possible for you to travel at nearly the velocity of light. In fact, if you move, for example, at 99.99999999 per cent of the speed of light, your wrist-watch, your heart, your lungs, your digestion and your mental process will be slowed down by a factor of 70,000 and the 18 years (from the point of view of people left on the earth) necessary to cover the distance from earth to Sirius and back to earth again would seem to you as only a few hours. In fact, starting from earth right after breakfast, you will just feel ready for lunch when your ship lands on one of the Sirius planets. If you are in a hurry and start home right after lunch, you will in all probability, be back on earth in time for dinner. But and here you will get big surprise if you have forgotten the laws of relativity you will find on arriving home that your friends and relatives have given you up as lost in the interstellar paces and have eaten 6570 dinners without you. Because you were traveling at a speed close to that of light, eighteen terrestrial years have appeared to you as just one day (One Two Three... Infinity, p.104).

অর্থাৎ- মনে করুন, আপনি 'সাইরিয়াস' গ্রহে বেড়াতে যাবেন। পৃথিবী হতে সাইরিয়াসের দুরত্ব নয় আলোক বছর, অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ কোটি মাইল। অন্য কথায় ঃ যদি আপনি রকেট শিপে যান, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌছতে পৃথিবীর সময়ানুসারে আপনার নয় বছর লাগবে। ফিরে আসতে আরও নয় বছর লাগবে। এত দীর্ঘ প্রবাসে প্রচুর রসদপত্র নিশ্চয় আপনি সঙ্গে নিতে চাইবেন। কিন্তু তার কোনই প্রয়োজন হবে না। সময় এত সংকুচিত হয়ে যাবে যে, এই আঠার বছর আপনার ঘড়িতে ১২/১৩ ঘন্টার বেশি বলে মনে হবে না। আপনি যদি পৃথিবী হতে সকাল বেলা চা খেয়ে রওয়ানা হন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছে আপনি দুপুরে লাঞ্চ খাবেন। লাঞ্চ খেয়েই যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন, তবে গৃহে ফিরে আপনি ডিনার খেতে পারবেন: অর্থাৎ আপনি রাত ৮/৯ টায় ফিরে আসবেন। আপনার বেলায় ত এই রূপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার স্ত্রী-পুত্র দেখবে, তাদের আঠার বছর পার হয়ে গেছে। কাজেই তারা এরই মধ্যে ৬৫৭০ টি ডিনার খেয়ে ফেলেছেন।

এই সব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনে অনেকে হয়ত অবাক হবেন। কিন্তু ইসলামের কাছে এসব কোন নতুন কথা নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সময় সম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেনঃ সূরা কাহাফে বর্ণিত 'আসহাবে কাহাফের' কাহিনিটি এখানে স্মরণীয়। গুহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ৩৭৫ বছরের উর্ধ্বকাল ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তাদের কাছে এক দিনের বেশি বলে মনে হয় নি। এ থেকে এই সত্য প্রতিপন্ন হয় যে, সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান আপেক্ষিক (relative)। বস্তুত স্থান, কাল মধ্যাকর্ষন বা গতির প্রশ্ন নিয়ে রাসুলুল্লাহর স্বশরীরে মি'রাজ আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। বরং অবস্থা এখন এ রূপ দাঁড়িয়েছে যে, মি'রাজ বিশ্বাস না করলে বর্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই আর বুঝা যাবে না। পৃথিবী হতে space-ship-এ চড়ে বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রালোকে এবং মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করছে- তা বিজ্ঞানের নবতম সাধনার ফসল। এই Öspace-ship I ididÖ বা 'রকেটের' সঙ্গে 'বোরাকের' কত নিকট সম্বন্ধ। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, বোরাকের কথা বললে তা ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস হয়, আর রকেটের কথা বললেই তা নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই মি'রাজকে বিশ্বাস করবার প্রধান অন্তরায়।

প্রশ্ন হচ্ছে মুহাম্মদ (দঃ) এর দেহ কি জড়ধর্মী ছিল? নবী করীম (দঃ) মানব ছিলেন বলেই যে তাঁর দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদান বিশিষ্ট ছিল তা ও নাও হতে পারে। বুনিয়াদ বা জাত এক হলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকারভেদ ত আছে। যেমন : করলা থেকে হীরক প্রস্তুত হয় এবং উভয়ই পদার্থ; তাই বলে

কয়লা ও হীরক কি এক বস্তু? আবার কাঁচ একটি জড় পদার্থ, বাঁধা দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমাদের আঙ্গুল তা ভেদ করে যেতে পারে না; কিন্তু কোন আলোকরশ্মি অনায়াসে তার জন্য নিজের দেহের ভিতর দিয়েই পথ ছেড়ে দেয়। আবার অনেক অস্বচ্ছ পদার্থের উপর যদি রঞ্জন রশ্মি নিক্ষেপ করা যায় তবে সে ঐ পদার্থকে ভেদ করে চলে যায়।

আবার যদি পানির কথা বলি, এর তিনটি রূপ রয়েছে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন বরফের আকার ধারণ করে এবং তা দিয়ে ঘর-বাড়ি পর্যন্ত তৈরি করা যায়। যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন তা আবার স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। আবার এই পানিকেই বাষ্পাকারে পরিণত করলে সে আমাদের চোখের আলক্ষ্যে মেঘলোকে উড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় কেউ যদি বলে পানি দ্বারা ঘরবাড়ি তৈরি করা যায় না, অথবা পানি উড়ে যেতে পারে না তবে কি তার কথা সত্য হবে? কাজেই আমরা কোন পদার্থকে যে বেশে দেখছি, তাই যে এর একমাত্র সত্যরূপ তা নাও হতে পারে। অতএব, আমাদের কথা হল, বাহির থেকে নবীজীর যে জড়দেহী মানবরূপ দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়দেহী ছিলেন না। নূর দ্বারাই তাঁর দেহ গঠিত ছিল। একারণে তাঁর দেহের কোন ছায়া ছিল না। সৃষ্টি সম্পর্কে নবীজী (রাঃ) নিজেই বলেছেন- "আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী।" অর্থাৎ : আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন তা আমার নূর। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন- "আনা নূরুমমিন নূরিল্লাহি ওয়া কুল্লা শাইইনমিন নূরী।" অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর হতে এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।

কোরআনে পাকেও ঘোষণা হয়েছে- "ক্বাদ যা'আকুম মিনাল্লাহি নূরুন ও কিতাবুম মুবিন।" (সূরা মায়িদা, আয়াত-১৫)

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন আল্লাহর নূর, ও স্পষ্ট কিতাব।

এ সমস্ত তথ্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নবীর দেহ আমাদের মত স্থূল উপাদানে গঠিত ছিল না, তাঁর দেহের উপাদান ছিল নূর। আর নূরের যেহেতু ওজন নাই তাই নূরের তৈরী মুহাম্মদ (দঃ) এর পক্ষে উর্ধ্ব গমন সম্ভব হয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে অক্সিজেন ছাড়া কিভাবে নবী করীম (দঃ) উর্ধ্বগজগত ভ্রমন করলেন। সহজ উত্তর হচ্ছে একটি ডিমের ভেতরে কিংবা মাতৃগর্ভে যদি আল্লাহ একটি বাচ্চাকে জীবিত রাখতে পারেন, তাহলে তাঁর পেয়ারা মাহবুব (দঃ) এর বেলায় কেন সম্ভব নয়?

মি'রাজ স্বপ্ন নয় ঃ

মি'রাজ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়। মি'রাজ যদি স্বপ্নই হবে তবে তা নিয়ে এত আপত্তি উঠবে কেন? নবীজী যদি বলতেন, আমি রাত্রে এটিকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তাহলে লোকদের অবিশ্বাস করবার কি থাকত? ব্যাপারটি ত সেখানেই মিটে যেত। স্বশরীরে গিয়েছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখেছিলেন বলাতেই ত যত আপত্তি। নবীজী শুধু এরূপ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমন কথা কোরআন হাদিসে কোথাও নেই। মোদ্দাকথা হল ঃ মক্কা শরীফ হতে স্বশরীরে মি'রাজ করার ঘটনাটি ছিল একবার। পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিকভাবে আরো মি'রাজ হয়েছে ৩৩ বার। (তফসিরে জালালাইন, হাশিয়া পৃঃ ২২৮)

মি'রাজের তাৎপর্য ঃ

জগত জুড়ে সসীম ও অসীমের লীলাখেলা চলেছে। সান্তের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে সান্ত এসে লুকোচুরি খেলা করছে। সান্ত ও অনন্ত চায় পরস্পরকে উপলব্দি করতে। মি'রাজ নবীর জীবনে সেই মহা উপলব্ধি। কেবল মাত্র সীমার মধ্যে বলে আমরা যেমন অসীমকে সত্য করে চিনতে পারি না, শুধু অসীমের মধ্যে থেকেও সেরূপ সসীমকে চেনা যায় না। অসীমের পরিপ্রেক্ষিতে সসীমকে না দেখলে কারও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। সৃষ্টিকে চিনার জন্য তাই নবীজীকে সৃষ্টিতে আসতে হয়েছিল, আবার স্রষ্টাকে চিনিবার জন্য তাঁকে স্রষ্টার নিকট যেতে হয়েছিল। এজন্যই সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান একেবারে সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। এ জন্য নবীজী অদৃশ্যের খবর জানতেন, ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারতেন। এটাই মি'রাজের তাৎপর্য।

মি'রাজের সার্থকতা ঃ

আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক ব্যাপারে নবীজী সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ন্তা ই মি'রাজের মূল কথা। কেননা তাঁর পূর্বাপরে কেউ এ সম্মান অর্জন করেননি। স্থান, কাল এবং গতির উপর মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, জড়শক্তিকে সে যে অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে মানুষের মধ্যেই যে বিরাট অতি মানুষ

ঘুমিয়ে আছে, মি'রাজ সে কথাই প্রমাণ করে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য সে দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নবীজীর মুহাম্মদ ও আহমদ নামকরণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাও এই মি'রাজের মধ্যে নিহিত আছে। চরম প্রশংসিত (মুহাম্মদ) এবং চরম প্রশংসা কারী (আহমদ) নবীজীর এই দুটি নাম যে বাস্তবিকই সত্য, তা কি আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে না? মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে প্রশংসার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়েছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভ, তাঁর মহিমা এবং সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য তন্ন তন্ন করে নবীজীকে দেখিয়েছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান বড় প্রশংসা এবং বড় যোগ্যতা মানুষ না পয়গাম্বর কারো ভাগ্যে জুটেনি। এদিক থেকে মুহাম্মদ নাম সার্থক হয়েছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া বিশ্বভুবনে আল্লাহ তায়ালার চরম প্রশংসাকারীই বা কে? আল্লাহর চরম প্রশংসা তিনিই করতে পারেন যিনি তাকে চরমভাবে চিনেছেন। চরমভাবে চিনিতে হলে চরম নৈকট্য প্রয়োজন। এই চরম নৈকট্যই মি'রাজের রাত্রে ঘটেছে। কাজেই একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই যে আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়দাতা ও চরম প্রশংসাকারী হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কি? এতেই নবীজীর আহমদ নাম স্বার্থক হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মি'রাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্যে পৌছার পথের সন্ধান দেয়। আমাদেরকে অসীম অনন্তের পথে উধাও হতে হবে এবং অজানাকে জানতে হবে, এ বাণীই মি'রাজ আমাদের কানে কানে বলে। মি'রাজের স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হলে আল্লাহর অস্থিত্ব এবং তাঁর নৈকট্য লাভ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়। মি'রাজ সত্যিই এক অপূর্ব দূর্লভ ঘটনা। এ সম্বন্ধে চিন্তা করলেও হৃদয় পবিত্র হয়; মনের দিকচক্রবাল সম্প্রসারিত হয়। সেই মহামানবের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম যিনি জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করে গেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) তাফসীরে কানযুল ঈমান, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রঃ)।

২) তাফসীরে জালালাইন।

৩) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৪) সহজ আকাইদ ও ফিকহ শিক্ষা, ইয়ামিন প্রকাশনী।

৫) আখলাকুন্নবী (দঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

লেখক:
সহকারি অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

"ঈমানের আলোর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি"
এস. এম. আব্দুল করিম তারেক
প্রোপ্রাইটর
KCS মেসার্স করিম ক্রোকারিজ ষ্টোর
যাবতীয় প্লাষ্টিক, ষ্টীল ও কাঁচের মাল পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়
পরিবেশক : শরীফ মেলামাইন সিংহ মার্কা দেখে নিন
১৮নং ওমর আলী মার্কেট, আশরাফ আলী রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৩৯১৬৭৬, ০১৭২২-২৬৮৩৬৮

সুন্নীয়ত প্রচারে আল্লামা গাযী আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.)'র অবদান ও আমাদের করণীয়

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন রেযভী *

আল্লামা গাযী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আলিম ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসলামী স্কলার। তিনি বংশগত দিক দিয়ে সৈয়্যদ, আকীদাগত সুন্নী, মাযহাবগত হানাফী, তরিকতের দিক দিয়ে কাদেরী এবং একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ম ব্যক্তিত্ব। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের শিক্ষা ও আদর্শকে তুলে ধরা ও সমাজজীবনে তা বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। তাঁর সংগ্রামী প্রচেষ্টার ফলে এদেশের মুসলিম সমাজ নিজেদের আসল পরিচয় খুঁজে পায় এবং ইসলাম বিকৃতকারী ও বিদ্বেষীদের সকল অপতৎপরতা প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা লাভে সমর্থ হয় এবং এতে সফলও হয়।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর চেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের সুন্নী মুসলমানদের যে বৃহত্তর ঐক্য ও মিলন গড়ে উঠেছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর ক্রমান্বয়ে তা নিস্তেজ হতে চলছে। ফলে সুন্নীয়তের বিরোধী সকল অপশক্তি আজ আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। এ দুঃসময়ে এ দেশের সুন্নী মুসলমানদের আল্লামা গাযী শেরে বাংলার আদর্শ ও চেতনায় পুণরায় জাগ্রত হওয়া সময়ের দাবী। যুগের এ দাবী পূরণের নিমিত্তে আজকের এই সেমিনার। নানা আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর জীবনার্দশ ও চিন্তা-চেতনার চর্চা ও গবেষণা অধিকহারে করা উচিত বলে মনে করি।

জীবন-সংক্ষেপ:

আল্লামা গাযী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.) ১৩২৩হিজরী মোতাবেক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক শুভলগ্নে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'মেখল' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ মেখলী আলকাদেরী ও মাতার নাম সৈয়্যদা মাযমুনা খাতুন। পিতা-মাতা উভয় দিকে তিনি সৈয়্যদ বংশীয় ও ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারের সন্তান।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা তাঁর সম্মানিত পিতার তত্ত্বাবধানে অর্জন করেন। অতঃপর হাটহাজারী 'মঈনুল ইসলাম' মাদ্‌রাসায় 'দাওরা-এ হাদীস' পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে দ্বীনিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা হেতু অনেক সুন্নী মতাদর্শী আলেম ও শিক্ষার্থীকে ওহাবী মাদ্‌রাসাগুলোতে শিক্ষকতা ও পড়াশোনা করতে হতো। হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় 'দাওরা-এ হাদীস' পর্যন্ত অধ্যয়নের পর উচ্চশিক্ষা লাভের মানসে তিনি ভারতে দিল্লীর অদূরে ফতেহপুর আলীয়া মাদ্‌রাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) হাটহাজারী মাদরাসায় লেখাপড়া করলেও দেওবন্দী-ওহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হননি। বরং ছাত্রজীবন থেকেই ওহাবীদের সাথে তাঁর মতের গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। তিনি আকীদাগত বিষয়ে ওস্তাদদের সাথে তখনও দ্বিমত পোষণ করতেন এবং অকাট্য দলিল পেশ করতেন। তখন থেকেই তারা তাঁকে ভয় করতো। পরবর্তীকালে এ মতানৈক্য প্রকট আকার ধারণ করে।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) স্বীয় জীবনে দু'বার পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৫৭ ইংরেজীতে তাঁর দ্বিতীয়বার হজ্বের সময় এ দেশের ওহাবীরা ষড়যন্ত্র করে সৌদি

সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করে বলে-'এ মাওলানা আযিযুল হক শেরে বাংলা মুসলমানদেরকে কাফির বলে, তাই তাঁর বিচার করা হোক।' ফলে সৌদি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে তৎকালীন সৌদি গ্রান্ড মুফতী সৈয়দ আলভী ইবনে আব্বাস মালেকী মক্কী সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। তিনি আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) কে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন- 'আমি কোন মু'মিন-মুসলমানকে কাফির বলি না। কিন্তু কিছু কিছু মুসলমান নামধারী লোককে কাফির বলি।' উদাহরণস্বরূপ তিনি ওহাবীদের লিখিত গ্রন্থ থেকে তাদের কুফরী উক্তিগুলো তুলে ধরেন। অতঃপর আল্লামা গাযী শেরে বাংলার সাথে ইসলামী আকীদার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উক্ত গ্রান্ড মুফতী সাহেবের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আল্লামা গাযী শেরে বাংলার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মুফতী-ই মক্কা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহারসহ তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হজ্ব পালন করার অনুমতি প্রদান করেন। অধিকন্তু মুফতী সাহেব আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) -কে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'শেরে ইসলাম' ওরফে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে লিখিত সনদপত্র প্রদান করেন এবং উপহারস্বরূপ একটি মূল্যবান পাগড়ি ও ছড়ি প্রদান করে বিশেষ রাজকীয় মেহমান হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্মান জানান।

তৎকালীন আন্দরকিল্লাস্থ শাহী জামে মসজিদের প্রাক্তন খতীব গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)এর বংশধর প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা গাযী সৈয়্যদ আবদুল হামীদ বোগদাদী (রাহ.) এর পবিত্র হাতে তিনি কাদেরী তরীকার বায়আত গ্রহণ করেন। এবং তাঁর কাছ থেকে উক্ত তরীকার খিলাফত ও ইজাযত লাভে ধন্য হন।

শরীয়ত ও তরীকতের মহান খিদমত আনজাম দিয়ে ১৩৮৯ হিজরীর ১২রজব (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯সালে)৬৩ বছর বয়সে এ মহান আশেকে রাসূল ইন্তেকাল করেন।

অদ্বিতীয় নবীপ্রেমিক:

আল্লামা গাযী আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.) ছিলেন ইশ্কে নবীর মূর্তপ্রতীক। তাঁর মতে 'নবী প্রেমই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।' এশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় অমূল্য রতন। যে ব্যক্তি এ নিয়ামতের অংশ পায়নি সে বড়ই হতভাগা। আর যে এ নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে, সে বড়ই সৌভাগ্যবান। নবীপ্রেমের এ শিক্ষাই তিনি আজীবন প্রচার করে যান। তিনি প্রায় সময় বলতেন- 'মাইতু বিমারে নবী হুঁ'। তাঁর নবীপ্রেমের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ লক্ষ্য করুন। ঘটনা হলো এ যে, আল্লামা শেরে বাংলা (র.) যখন মেখল ফকিরহাট এমাদাদুল উলুম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করতেন তখন তাঁর সাথে রাউজান পাহিরা এফ, কে, জামেউল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা দোস্ত মুহাম্মদ এবং রসূলাবাদ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা গোলাম কাদেরও শিক্ষকতা করতেন। উল্লেখ্য যে, তাঁরা উভয়ে আল্লামা শেরে বাংলা (র.) এর কাছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা-মাতার ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা-মাতা উভয়ে মুমিন ছিলেন।' তাঁরা আবার বললেন, 'হুযুর আপনি বলছেন তাঁরা উভয় মুমিন ছিলেন, অথচ ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক রচিত 'ফিকহে আকবর' এ 'মা'তা আলাল কুফরি' অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা-পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে বলে বর্ণনা দেখা যায়।' এ বর্ণনা শুনে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা এশকে নবীর জালালিয়্যতে উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'অসম্ভব! ইমাম আযম (র.) এ প্রকার বর্ণনা করতে পারেন না। হ্যাঁ! তিনি যদি জেনেশুনে এ রকম মন্তব্য করে থাকেন তা হলে আমি বলছি ইমাম আযমের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে তো আমি জানি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মাধ্যমে। তাঁর দ্বারা যদি আমার প্রিয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন তাঁর মাযহাবের অনুসরণ আমার কোন কাজে আসবে না।' অতঃপর আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে যখন উক্ত 'ফিকহে আকবর' খুলে দেখানো হলে তখন তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বললেন, 'আজ রাতে ইমাম আযম যদি স্বপ্নে বা বাস্তবে এসে 'ফিকহে আকবর' এর এ বর্ণনার কোন যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত পেশ না করেন আমি আগামীকাল হানাফী মাযহাব ত্যাগ করবো।' আল্লামা গাযী শেরে বাংলার এরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার শুনে সকলে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এখানেই তাঁদের আলাপ মুলতবী হল। পরদিন আল্লামা গাযী শেরে বাংলা অতি আনন্দচিত্তে ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মাদ্‌রাসার অফিসে প্রবেশ করে সকলকে সালাম জানালেন এবং গতদিনের ঘটনা প্রবাহের অবতারণা করে তিনি বললেন-'আমি গতরাতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিছানায় শুয়ে দরূদ শরীফ পড়ছিলাম। আমার তন্দ্রা আসলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইমাম আযম (র.) কে দেখতে পেলাম। আমি ভক্তিসহকারে তাঁদেরকে সালাম আরয করলাম। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্নেহে এরশাদ করলেন-'আযিযুল হক! আমার প্রেমে বিভোর হয়ে তুমি ইমাম আযমের মাযহাব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। আমি জানি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা সুগভীর। ইমাম আযম তোমার মাযহাব ত্যাগের সংকল্প জেনে আমার সুপারিশের আশ্রয় নিয়েছে। অতএব তিনি যদি তাঁর বর্ণনার যথার্থ কারণদর্শাতে পারেন তাহলে তোমার হানাফী মাযহাব ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই আসেনা।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ শুনে আমি আরয করলাম, হুযুরের আদেশ শিরোধার্য। অতঃপর হযরত ইমাম আযম আবূ হানাফী (র.) আমাকে সম্বোধন করে বললেন- "প্রিয় বৎস! আমার কোন দোষ নেই। আমি লিখেছিলাম- 'মা-মা'তা আলাল কুফরি।' অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা-মাতা কুফরীর উপর ইন্তেকাল করেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাফেযীগণ আমার প্রতি ষড়যন্ত্র করে উক্ত বাক্যের 'মা' শব্দটি বাদ দিয়ে ফেলে। এতে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়।" এরপর আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এটাই ছিলো আল্লামা গাযী শেরে বাংলার (র.) হুকো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ নবীপ্রেম তাঁর ভেতর সর্বদা জাগরূক ছিলো বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদায় সামান্যতম বেয়াদবীকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সিংহের মতো হুংকার দিয়ে তিনি নবী বিদ্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলায় মিশিয়ে দিতেন। যেমন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, হাযের-নাজের, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিলাদ পাঠকালে দাঁড়িয়ে সালাম জানানো, মিলাদুন্নবী উদযাপন, ওরস-ফাতিহা ইত্যাদি বিষয়সহ দেওবন্দী মৌলভীদের বিভিন্ন কুফরী উক্তি নিয়ে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর সাথে এদেশের দেওবন্দপন্থী ওহাবীদের একাধিকবার সম্মুখ তর্ক বা মুনাজেরা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব তর্কযুদ্ধে ওহাবীদের বড় বড় মৌলভীরা প্রতিবারই আল্লামা গাযী শেরে বাংলার জ্ঞানগর্ভ যুক্তি-তর্কের সাথে নিজেদেরকে অসহায় বোধ করতো। শেষ পর্যন্ত সভাস্থল থেকে ওহাবী মৌলভীদের পলায়ন করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য ও তর্কযুদ্ধের সাথে এটে উঠতে না পেরে ওহাবীদের শীর্ষস্থানীয় মৌলভী-মুফতীদের পরামর্শক্রমে আল্লামা শেরে বাংলা (র.) কে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। এ অসৎ উদ্দেশ্যে তারা কয়েকজন মুনাফিক চক্রের মারফতে তাঁকে বাহ্যিক ভক্তির বেশে হাটহাজারী থানার খন্দকিয়া গ্রামে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায়। বাদে এশা যথারীতি আল্লামা শেরে বাংলা (র.) মাহফিলে তশরীফ নিয়ে যান। যখন তিনি 'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু... বলে তকরীর শুরু

করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ওহাবীরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ মাহফিলের লাইট ও মাইক বন্ধ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। অতঃপর এজিদী কায়দায় তাঁর উপর পেছন থেকে অতর্কিত হামলা করে বসে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। মাথা ফেটে তীব্র বেগে রক্ত প্রবাহিত হয়। এভাবে আঘাতের পর আঘাত করে মৃত্যুবরণ করেছে মনে করে পার্শ্বের কাঁটা ঝাড়ের মধ্যে তাঁকে ফেলে দেয়। পরে এ ঘটনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে সুন্নী জনতাগণ তাঁকে ওহাবীদের কবল থেকে উদ্ধার করে হাটহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সুন্নী জনতার মধ্যে প্রতিশোধের দাবানল জ্বলে উঠে। চতুর্দিকে শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লাঠিপেটা। হাটে-বাজারের সর্বত্র ওহাবী পেলেই সুন্নীজনতার লাঠিপেটার শিকার হতে হতো। এরূপ বিস্ফোরোন্মুখ পরিস্থিতিতে তৎকালীন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ.কে.ফজলুল কাদের চৌধুরী ও দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ফজলুল কাদের চৌধুর সুন্নী জনগণকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শান্ত হতে বলেন এবং ওহাবীদের হীন আচরণে দুঃখ প্রকাশ করতঃ তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতঃ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। অবশেষে তিনি আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর রোগশয্যা থেকে প্রদত্ত 'অনুরোধ বাণী' পাঠ করে শুনান। আল্লামা শেরে বাংলা (র.) তাঁর প্রদত্ত বাণীতে সুন্নীজনতাকে শান্ত হওয়ার আহবান জানান। আর এ ঘটনার কোন প্রতিশোধ না নেয়ার এবং সকলকে ধৈর্যধারণ করার আহবান জানান। তাঁর এ আহবানের পর তেজোদীপ্ত সুন্নীজনতার হৃদয়ে শান্তির পরশ নেমে আসে। সুন্নীজনতার লাঠিপেটা থেকে ওহাবীরা রেহায় পায়। মাসাধিককাল চিকিৎসার পর অবশেষে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। হাসপাতাল ত্যাগের দিন তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য হাজার হাজার জনতা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে নারায়ে তকবীর ও নারায়ে রেসালতের শ্লোগান দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। সবাই হুযুরকে সাথে নিয়ে লালদিঘি ময়দানে উপস্থিত হন। এ.কে. ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) কে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। তৎকালীন বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ সম্বর্ধনা সভার প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয় যে,

'বিগত ৩রা জুলাই শেরে বাংলা আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব দীর্ঘ দেড়মাস যাবৎ হাসপাতালে অবস্থান করিয়া আরোগ্য লাভের পর হাসপাতাল হইতে বাহির হন। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য শহরের বিভিন্ন মহল্লা হইতে মিছিল সহকারে জনসাধারণ আসিয়া হাসপাতালের সম্মুখে জমায়েত হয়। মাওলানা সাহেব হাসপাতাল হইতে বাহির হইলে অপেক্ষমান জনতা শেরে বাংলা জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মুখরিত করে তোলে। অতঃপর বিরাট মিছিল সহকারে তাঁকে লালদিঘির ময়দানে লইয়া যাওয়া হয়।

চট্টগ্রাম জিলা ইসকুল বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এ.কে এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দশ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। সভায় মাওলানা সাহেবের সুস্থতা কামনা করিয়া খোদার দরবারে মোনাজাত করা হয়। পুলিশ গাফেলতির তীব্র নিন্দা করা হয় ও ওহাবীদের মূলোচ্ছেদ করিবার এক সিদ্ধান্ত করা হয়।..." (সূত্রঃ দৈনিক আজাদ, ১৩জুলাই ১৯৫১, শুক্রবার)

উল্লেখ্য যে, আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর উপর দেওবন্দী-ওহাবীদের এ বর্বরোচিত জঘন্যতম হামলার বিচার রায় তৎকালীন বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক কোহিনুর' পত্রিকায় ২৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রতিবেদকের ভাষায়- আদালতের এ বিচার ওহাবীদের শুভামীর তুলনায় অতি নগন্য।

সুন্নীমত প্রচারে তাঁর অবদান ও আমাদের করণীয়ঃ

ইসলামের সঠিক ও অবিকৃত রূপরেখা আহলে সুন্নাত

ওয়াল জামাতের শিক্ষা ও দর্শন প্রচারে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) বহুমুখী অবদান রেখে যান। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর সরব বিচরণ ছিলো। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বাস্তব ও ফলপ্রসু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। তাঁর গৃহিত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

১. সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি:

এ কথা বাস্তব সত্য যে, যে-কোন মতাদর্শের সফল বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিকল্প নেই। আরবী প্রবাদ আছে - 'আন-নাসু আলা দ্বীনি মুলূকিহিম' অর্থাৎ জনগণ রাজার নীতিকে অনুসরণ করে। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্বকে সুন্নীয়তের আর্দশ প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার বলে বিশ্বাস করতেন বলেই তিনি সুদীর্ঘ সতের বছর নিজ এলাকা মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও তৎকালীন ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ন্যায়বিচার ও সততার জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি প্রতিবারই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী ওহাবীরা পর্যন্ত তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করতো। কারণ তাদের মন্তব্য ছিলো 'তাঁকে চেয়ারম্যান করা হলে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে।' তিনি ছিলেন মানবকল্যাণে নিবেদিত এবং ন্যায় ও সাম্যের মূর্তপ্রতীক। গরীব ও দুঃখী মানুষের সুখে-দুঃখে একান্ত আপনজন।

শুধু তা নয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশের) সকল সুন্নী মুসলমানকে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আল্লামা গাযী শেরে বাংলা 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামক রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া 'আনজুমানে এশায়েত আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত পূর্ব পাকিস্তান' নামক অপর একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) ছিলেন অকৃত্রিম দেশ-প্রেমিক। সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী হবার কারণে এবং দেশের স্বাধীনতাকামী দল হিসাবে তিনি তৎকালীন মুসলীম লীগের শুভাকাঙ্খী ছিলেন। এ দলের এ দেশীয় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ছিলো তাঁর সুগভীর সম্পর্ক। এ সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুন্নীয়তের শিক্ষা ও আদর্শকে জনগণের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াস পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর এ সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। স্বাধীনতার প্রায় ২০ বছর পর কিছু সুন্নী তরুণ ও যুবকের প্রচেষ্টায় আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্লাটফরম গড়ে উঠে। এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান সুন্নীয়তের আন্দোলনে এ দেশে যে সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে তার সত্যিকার রূপকার হচ্ছেন আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.)। যা তাঁর চিন্তা-চেতনার বাস্তব ফসল বলা চলে।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.)'র উত্তরসূরী দাবীদাররা যদি স্বাধীনতার পরপরই তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হতো তবে আজ সুন্নীদের এ দূর্দিনের মুখ দেখতে হতো না। অপরদিকে বাতিলরাও এতটুকু অগ্রসর হতে পারতো না।

২.সংস্থা-সংগঠন ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা:

ইসলামের নামে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার লক্ষ্যে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেন আনজুমানে এশায়াতে আহলে সুন্নাত' নামক সামাজিক সংগঠন। তাছাড়া তিনি হিন্দুস্থান থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর যখন দেখলেন দেওবন্দী-ওহাবীরা সুপরিকল্পিতভাবে একত্যবদ্ধ হয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানদের ঈমান-আকীদাকে বিনষ্টের জন্য মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তিনি এদেশের সুন্নী মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষার তাগিদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের মতাদর্শ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সর্বপ্রথম ১৯৩২ সালে নিজ গ্রাম মেখল ফকিরহাটে প্রতিষ্ঠা করেন 'এমদাদুল

উলুম আযিযিয়া সুন্নীয়া মাদ্‌রাসা'। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য পৃষ্টপোষকতা ও গতিশীল নেতৃত্বে দেশের আনাচে-কানাচে অনেক সুন্নী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বিশেষত রাহনুমায়ে শরীয়ত ওয়া তরীকত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (র.) কে এ দেশে আগমনের ব্যবস্থাকরণ এবং এ দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া' প্রতিষ্ঠার পেছনেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.)এর সক্রিয় ভূমিকা ও নিরলস প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। তাছাড়া সুন্নী মতালম্বী, শিক্ষানুরাগী দানবীর ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তিনি যে- সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তা হচ্ছে-

১. আযিযীয়া অদুদিয়া সুন্নীয়া মাদরাসা, হাটহাজারী।
২. ফতেহনগর অদুদিয়া মাদরাসা।
৩. চন্দ্রঘোনা অদুদিয়া তৈয়্যাবিয়া মাদরাসা; রাঙ্গুনীয়া।
৪. হামিদিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা, লালিয়ার হাট।

৩. লেখনী:

যে-কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লেখনী হচ্ছে অন্যতম উপাদান। এক্ষেত্রেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) বিশেষ অবদান রেখে যান। যে-সব বিষয় নিয়ে ওহাবীদের সাথে প্রায় সময় তাঁর বির্তক হতো, ওইগুলোর দলিলসমূহ পরবর্তী সুন্নী ওলামায়ে কেরামের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে লিখে যাবার তীব্র প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন বিধায় শত ব্যস্ত্মতার মাঝেও তিনি শক্ত হাতে কলম তুলে নেন। তাঁর লেখনীগুলোর মধ্যে দিওয়ান-এ আযীয, মাজমূআহ, ফাতওয়া-ই আযীযিয়া, ঈযাহুদ দালালাত,(ফাতওয়া-এ মুনাজাত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অকাট্য দলিল সহকারে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব এবং শরীয়ত ও তরিকতের যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়ে যান।

বিশেষত ফার্সী ভাষায় লিখিত তার 'দীওয়ান' ফার্সী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এ দেশের সুন্নী আলিম-ওলামা, পীর-মাশাইখ ও সূফীয়া-ই কিরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেশ করা। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে বাংলাদেশ, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এমন বিদগ্ধ আলিম-ওলামা ও পীর-দরবেশদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন, যাঁদের অবদানের কথা এমনকি নাম পর্যন্ত এ দেশের মানুষ ভুলে যাচ্ছিল। অথচ আমাদের ধর্ম ও সমাজজীবনে ওইসব মহামনীষীর অবদান ছিলো অপরিসীম। তাই আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) রচিত এ 'দীওয়ান' আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলার পীর-আউলিয়া, সূফী-দরবেশ ও বিদগ্ধ আলিম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণী সমাজের ইতিহাস রচনায় ইতিহাসবিদগণ তাঁর এ গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এ ছাড়া এতে আরো বর্ণিত হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক যুগজিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান। যেমন, শর্তসাপেক্ষে 'সেমা' বৈধ হওয়ার বর্ণনা, সাজদা-ই তাহিয়্যা (সম্মানার্থে সাজদা করা) সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ ও পর্যালোচনা, আল্লাহর পুণ্যাত্মা বান্দা আউলিয়া-ই কিরামের মাযারে আলোকসজ্জার বৈধতা, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার চুম্বনের বৈধতা, আউলিয়া-ই কিরামের মাযারে গিলাফ-চাদর-ফুল চড়ানোর বৈধতা, ইয়া রসূলাল্লাহ বলে সম্বোধন করার বৈধতা, ফাতেহাখানী, কুলখানী, কুরআনখানী, যিয়ারত, চেহলাম ইত্যাদির বৈধতা, জুম'আর রাতে মৃতদের কবর ঘরে আসা প্রসঙ্গে, বরাত ও কদর রাতসমূহে জমাতসহকারে নফল নামায আদায়ের বৈধতা, লাউড স্পীকার বা মাইকযোগে ইবাদতের বৈধতা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় নাম শ্রবণে ভক্তি ও মুহাব্বত সহকারে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের বৈধতা, শবে বরাত ইত্যাদির মত পুণ্যময় রাতে কবর যিয়ারত ও ফাতেহাখানির বৈধতা এবং ফরয নামাযের পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করার বৈধতাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুগজিজ্ঞাসার তথ্যনির্ভর সমাধান হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ফার্সী ছন্দে সুনিপুণভাবে সাজিয়েছেন তাঁর এ ফার্সী গ্রন্থে।

উপরিউক্ত এ নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর 'দীওয়ান'

গ্রন্থটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র অনুসারীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। পাকিস্তানের বিশিষ্ট উর্দু-ফার্সী সাহিত্য সমালোচক, জনপ্রিয় গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'মা'আরিফ-ই রেযা'র সম্পাদক আল্লামা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী 'দীওয়ান-ই-আযীয'র ভাষা, ছন্দ ও নানা বৈশিষ্টোর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন- "ভাষা ও বর্ণনাশৈলী, উপমা-উৎপ্রো এবং পরিভাষার যথাযথ ব্যবহার ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর দক্ষতা এবং কবিতা ও কাব্যে তাঁর গভীর সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। ভাষার সরল প্রবহমানতা দেখে এমন মনে হয়, এটা কোন ফার্সী ভাষাভাষী কবির কবিতা। তাঁর কবিতায় ইসলামী বিদ্যাসমূহ ছাড়াও সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তাঁর সুগভীর জ্ঞানের ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুতঃ 'দীওয়ান-ই আযীয' বিষয়বস্তু ও কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ঐতিহাসিক বরং ইতিহাস সৃষ্টিকারী গুরুত্ববহ 'দীওয়ান'।

(সূত্রঃ আল্লামা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী, আপনে দেশঃ বাংলাদেশ মে, মা'আরিফ-ই রেযা, জানুয়ারি ২০০৫ (পাকিস্তান, করাচি) পৃষ্ঠা-২৮)

আল্লাহর হামদ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র না'ত এবং প্রায় ২৭০ জনের মত আল্লাহর পুণ্যাত্মাবান্দা আউলিয়া-ই কিরাম, পীর-মাশাইখ, আলিম-ওলামা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের শানে রচিত ২১৫ পৃষ্ঠার এ বিশাল কাব্যগ্রন্থের শব্দের চয়ন, বিন্যাসের নিপুণতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতায় ফার্সী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বলা চলে। বিশেষতঃ আমাদের পূর্বসূরীদের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে জানার এক অনন্য মাধ্যম। মোটকথা, এ দেশের মুসলমানদের কুরআন-সুন্নাহসম্মত হাজার বছরের লালিত আদর্শ ও ঐতিহ্যকে যখন এক শ্রেণীর দুরাচার আলিমগণ কুফর ও শিরক বলে ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) সম্মুখতর্ক, ওয়াজ-নসীহত, লেখনী সর্বোপরি সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্লাটফরম থেকে এ দেশের সুন্নী মুসলমানদের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে যান। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শিক্ষা ও আদর্শের সফল বাস্তবায়নে এবং সুন্নীয়ত বিরোধী সকল বাতিল-মতবাদের মোকাবেলায় আমাদেরকেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা (র.) এর কর্মপন্থা অনুসরণ করা আজ সময়ের দাবী। আল্লাহ তাওফিকদাতা। আমিন।

তথ্যসূত্র :
১. আল্লামা গাযী শেরে বাংলা দিওয়ানে আযিয, ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম।
২. শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল-কাদেরী : তোহফায়ে আজীজিয়া, ১ম খন্ড, (১৯৯৬) আস্তানায়ে গাউসিয়া খানকায়ে কাদেরীয়া, আমবাগান, চট্টগ্রাম।
৩. ডা: সফিউল আলম জীবনী গ্রন্থ আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা, (১৯৯৬) আল হাসনাইন একাডেমী চট্টগ্রাম।
৪. মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান: বাগে খলীল, ২য় খন্ড।
৫. মুহাম্মদ বদিউল আলম বিজভী: সুন্নীয়তের পক্ষধর, (১৯৯৮) রেযা ইসলামিক একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৬. আহমদ মমতাজ : চট্টগ্রামে সূফিসাধক, ২য় খন্ড (২০০৬) দিশা প্রকাশনী।
৭. মাসিক তরজুমান : রজব ১৪২১/ অক্টোবর ২০০০ এবং রজব ১৪২৭/আগষ্ট ২০০৬
৮. সুন্নীয়তের আওয়াজ, (২০০৬) ইমাম শেরে বাংলা (র.)'র বার্ষিক ওরস স্মারক, আল্লামা গাযী শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

লেখক :
সহ-সভাপতি : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
পরিচালক : আল-আমিন বারীয়া দরসে নিযামী মাদরাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

মাসিক
ঈমানের আলো
THE MONTHLY IMANER ALO
সঠিক আক্বিদা ও আমলের সমন্বয়ে
প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন, গ্রাহক হোন
যোগাযোগ : সম্পাদক-০১৮১৭৭৪৫৬৯৪
বিঃদ্রঃ প্রতি ইংরেজী মাসের ৫ তারিখ ঈমানের আলো প্রকাশিত হয়।

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, শ্রমের মর্যাদা ও শিশুশ্রম

মাওলানা মুহাম্মদ জানে আলম নেজামী *

বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে শ্রমজীবি মানুষের রয়েছে অনস্বীকার্য অবদান। যা কোনভাবেই বিস্মৃত হবার নয়। যাদের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ঘামের উপর দাড়িয়ে রয়েছে অপরূপ এ বসুন্ধরা। সুতরাং এসব মানুষগুলো কোন ক্রমেই অপাংক্তেয় ও তাচ্ছিল্যের শিকার হতে পারে না। এরাও মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য যে, সুদুর অতীত থেকেই এ খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষগুলো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রম দিয়েও উপযুক্ত মজুরী পেত না। যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পেতো তা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন ছিল তা সত্ত্বেও এরা থাকতো তুষ্ট-পরিতৃপ্ত। প্রায় দেড়শত বছর আগের কথা। মালিক শ্রেণীর শোষন-নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে তাদের মনে ভাব জাগে, মুখে ভাষা জাগে। অতঃপর তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠল। ১৮৬০ সালে মজুরী কর্তন না করে দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমের সময় নির্ধারনের দাবি উঠল। যা ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত দাবি মেনে নেওয়ার সময় সীমা বেঁধে দেয়। কিন্তু এ লক্ষ্যে কোন প্রকার সাড়া কিংবা হরকত পরিলক্ষিত না হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে সমবেত হয়। তাদের এ আন্দোলন চলাকালীন ৭জন পুলিশ সদস্যের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ শ্রমিকদের উপর বেপরোয়া গুলি বর্ষন করে। ফলে ১৯ জন আন্দোলনকারী নিরীহ শ্রমিক নিহত হয়। রক্তক্ষয়ী এ আন্দোলনের সফল পরিনতিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা মজুরীর দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। এবং ১ মে প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবি আদায় দিবস হিসেবে। অতএব এ মে দিবসের মাধ্যমেই শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, বছর ঘুরে মে দিবস আসে আবার চলে যায়। সরকার প্রধান, রাজনৈতিক মহল, শ্রমিক সংগঠনের বাণী, আলোচনা সভা ও নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এর সাথে সাথে সবাই ভোগ করে একদিনের মে দিবসের ছুটি। কিন্তু বছরের পর বছর এই মে দিবস পালিত হলেও "যে লাউ সে কদ্দুই" রয়ে গেছে। অতএব আজ শপথ নিতে হবে, শ্রমজীবীসহ সব মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার। সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে জাতীয় উন্নয়ণের পূর্বশর্ত শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। শ্রমিকের অধিকারগুলো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বর্ণনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিম্নে সবিস্তারে তুলে ধরা হলো।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পূর্বে বান্দার রিযিক সৃষ্টি করেছেন। বান্দা কোথায় যাবে, কি খাবে, কি করবে সব কিছু তার কুদরতি ইলমে জানা আছে। তাই জীবিকা উপার্জনের তাগিদ দিয়ে পবিত্র কালামে পাকের সূরা জুময়ায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- যখন তোমাদের নামায শেষ হয় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও রিযিক অনুসন্ধান কর। মসজিদের মিনারে যখন আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন মুমিন মুসলমানদের যাবতীয় কাজ-কারবার, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে এবং নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে আবার আপন আপন কাজের মাধ্যমে হালাল রুজি উপার্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়ার তাগিদও দেওয়া হয়েছে। হযরত ইরাক ইবনে মালিক (রাঃ) জুময়ার নামায শেষ করে মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তোমার ফরয নামায আদায় করেছি। এখন তোমার নির্দেশ মতোই রুজির জন্য বের হলাম। অতএব তোমার অনুগ্রহের ভান্ডার হতে আমাকে রিযিক (রুজি) দান কর। আর তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

অপর হাদিসে ইবনে আবু হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুময়ার দিন নামায শেষে ক্রয়-বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তায়ালা তার

উপার্জনে সতর্কতন বরকত দান করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- ক্রয় বিক্রয় ও সর্বকাজের মাঝে আল্লাহর যিকির করতে থাক এবং তোমাদের পার্থিব কাজকর্ম যেন আল্লাহর স্মরণ হতে তোমাদেরকে দূরে না রাখে। কারণ উহাই তোমাদের আখিরাতের পুঁজি।

ইসলামী সমাজে সকল ব্যক্তিই শ্রমিক। তাই শ্রমিকের উপার্জনের এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা মালিকের মতোই হতে হবে। গোলামের জীবণযাত্রার মান সম্পর্কে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। মালিক যে রকম খাবার খাবে, যে রকম পোষাক পরিধান করবে, যে রকম বিছানায় ঘুমাবে গোলামকেও তাই দিতে হবে।

হালাল রুজি উপার্জনের তাগিদ

মহান আল্লাহ তায়ালা জীবিকার উপাদান বিশ্বে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। বান্দা পরিশ্রম করে মহান রাজ্জাকের নিকট হতে রিযিক গ্রহণ করবে এটাই আল্লাহর বিধান। শুধু রিযিক উপার্জন করলে হবে না। বরঞ্চ হালাল রিজিক উপার্জন করতে হবে। এটির দিকে তাগিদ দিয়ে সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে হালাল আহার্য গ্রহণ কর ও আল্লাহর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা যথার্থ ইবাদতকারী হও।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানদার বান্দাগণকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হতে হালাল আহার্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলেছেন। কারণ হালাল রুজি বান্দাগণের দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য জরুরী। আর হারাম রুজি বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ হারাম রুজি দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায়। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীজি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা পাক-পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতিত অন্যকিছু কবুল করে না। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীজি বলেছেন- অন্যান্য ফরযের মতো হালাল উপার্জনও একটি ফরয (বায়হাকী)।

ইসলামী সমাজে সবাই শ্রমিক বা উপার্জনকারী। হযরত আদম (আঃ) হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই ছিলেন উপার্জনকারী। অধিকাংশ নবী জীবিকা নির্বাহের জন্য মেষ পালন করেছেন। আমাদের নবীও মেষ চরাতেন। আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বিবি খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে নবীজি বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। তিনি কূপ থেকে পানি তোলার পারিশ্রমিক হিসেবে এক বালতির জন্য একটি করে খেজুর পারিশ্রমিক পেতেন। প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।

উপার্জনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষের বহু আবেগ অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতায় কোন মহৎ গুণের স্থান নেই। এ সভ্যতা মানুষের জীবনকে যন্ত্রের মত বধির বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুবাদী সভ্যতা বহু দেশে শিষ্টাচারের মত বিষয়কে খর্ব করেছে। যেমন মাতা-পিতার অধিকার, আত্মিয়ের অধিকার ও নারী-পুরুষের অধিকার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছে। কোরআন নারী-পুরুষের অধিকারকে আল্লাহর অধিকার, মাতা-পিতার অধিকার ও আত্মীয়তার অধিকারের পাশাপাশি স্থান দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে এসেছে- পুরুষের জন্য সে অংশ, যা তারা উপার্জন করে এবং নারীদের জন্য সে অংশ যা তারা উপার্জন করে। (সূরা-নিসা)

শ্রমিকের অধিকার

মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিধান মোতাবেক কাজ করার নামই হলো শ্রম। এক অর্থে প্রতিটি মানুষ শ্রমিক। পরিশ্রম ছাড়া মানুষের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব। তাই মানবজাতির দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়, তা হচ্ছে উত্তম রিযিক। যেকোন কাজ করাকে শ্রম বলা হয়। সাধারণ অর্থে যারা পরিশ্রম করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়। প্রচলিত অর্থে সমাজে বা রাষ্ট্রে যারা অন্যের অধীনে অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়।

শ্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন- শ্রম বলতে সকল ধরণের উন্নত, পেশাগত, দক্ষতা এবং অদক্ষ শ্রমিক ও কারিগরদেরকে বুঝায়, যারা শিক্ষা, শিল্প, কলা,

সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিচার, প্রশাসন ও সরকারের শাখায় নিয়োজিত রয়েছেন।

অপর অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেছেন- মানসিক বা শারীরিক যে কোন ধরণের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের জন্য করা হয় তাই হলো শ্রম। শ্রমিকের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই শ্রমিকের অধিকারগুলো কোরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হলো

ইসলামে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ

আজকের সভ্য সমাজে মনিবরা শিশু শ্রমিকদের কাছ থেকে কঠোর শ্রম আদায় করে এবং সেখানে নিজেদের স্বার্থ স্বপক্ষীয় চিন্তা ছাড়া শিশু শ্রমিকদের কল্যাণের কোন চিন্তা থাকে না। ফলে শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানী, রোগ-শোক, ও দুঃখ যাতনার শেষ নাই। তাদের খাওয়া পরাও মনিবের চেয়ে নিকৃষ্ট। তারা শীত ও গরমে পোষাকের কারণে কষ্ট পায়। যা সত্যিই দুঃখজনক। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, মনিবেরা শিশু শ্রমিকের সাথে যে কঠোর ব্যবহার করে তার করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবেনা এমনটি নয়। কেননা তাদের ভাগ্যও অভিন্ন হতে পারে। তাই মনিবের জন্য প্রিয়নবী (দঃ) বলেছেন- যে দয়া করে না সে দয়া পাই না। (বুখারী-মুসলিম)

অন্য হাদীসে নবীজী বলেছেন- আমর ইবনে শোয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইসলাম শিশু শ্রমিকদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের থেকে শ্রম নেওয়া নিষিদ্ধ করেছে। অতএব শিশুদের দ্বারা কোন কাজ বা শ্রম আদায় করা ইসলাম চিরদিনের জন্য রহিত করেছে।

আবু কাতাদাহ হারেস বিন বেরউ থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাঃ) বলেন, আমি যখন নামাযে দাড়ায় তখন তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই তখন নামায সংক্ষেপ করি। যেন সন্তানের মায়েদের ব্যথা না হয়। (বুখারী)

হাদীস শরীফে আরো বর্ণনা এসেছে- নবীজী (সাঃ) নামাযের মধ্যে শিশু উমামা কে কাঁধের উপর রেখে নামায পড়তেন। উমামা তার কন্যা সন্তান ছিল। নবীজীর কলিজার টুকরা নাতিদ্বয় হাসান-হুসাইন কে নিয়ে নামায আদায় করতেন। তিনি সিজদায় গেলে তারা তার পিঠে উঠে বসে থাকতেন। তারা যেন বিরক্ত না হয় সেজন্য তিনি দীর্ঘ সিজদায় থাকতেন। এবং তিনি অন্যান্য মুসল্লিদের ইমামতি করেন।

নবীজী (সাঃ) সফর থেকে মদিনার দিকে আসলে শিশুরা দৌড়ে তার কাছে আসতো। তিনি তখন তাদেরকে সামনে এবং পিছনে সওয়ারীর মত আরোহন করাতেন। কোন কোন সময় মহিলারা শিশুকে বরকতপূর্ণ দোয়ার জন্য নিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে কোলে নিতেন। শিশুরা কোলে প্রস্রাব করে দিলে মায়েরা অস্বস্থিবোধ করত এবং অনুরোধ জানাতো যেন তিনি তাদেরকে কাপড় দিয়ে দেন, তারা ধুয়ে দিবে। কিন্তু তিনি তাদের কাপড় না দিয়ে তাতে পানির ছিটা দিতেন। এভাবে মায়ের দায়িত্ব হালকা করে দিতেন।

সামর্থ্যের বর্হিভূত কাজ দেওয়া যাবে না

শ্রমিকেরাও আমাদের মতো মানুষ। শ্রমিক বলে তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখার কোন সুযোগ নেই। শ্রমিকের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ দেওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন- কোন ব্যক্তিকে তার শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্তি বহন করতে দেওয়া যাবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন,

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে চান। কারণ মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা-নিসা)

শ্রমিকদের উপর অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো কিংবা অবাঞ্ছিত কষ্ট দেওয়া কখনো ইসলাম সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে মানবতার নবী বলেছেন - তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব তাতে তাদের সাহায্য নাও। আবার শ্রমিকদের পক্ষে যে কাজ অসম্ভব তাতে তোমরাও তাদেরকে সাহায্য কর। (আদাবুল মুদরাদাত)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন- ইমরান ইবনে হারেস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাঃ) বলেছেন- তোমরা কাজের লোকদের যে পরিমাণ হালকা কাজ

দিবে, কিয়ামতের দিন তার ওজন সেভাবে হালকাভাবে গ্রহণ করা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

মজুরী বা বেতন নির্ধারণ করা

অর্থনীতিবিদদের মতে, সাধারন অর্থে, মজুরী বলতে শ্রমিকের পারিশ্রমিককে বুঝায়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কোন শ্রমিক তার দৈহিক ও মানবিক শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক অর্জন করে তাকে মজুরী বলে। যেকোন শ্রমিক নিয়োগের প্রথমেই মজুরী বা বেতন নির্ধারণ করা আবশ্যক। কেননা বেতন নির্ধারণ না হলে পারস্পারিক ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাই শ্রমিকের বেতন নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এছাড়াও শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্য অংশিদারিত্ব প্রাপ্তির অধিকারের বিষয়টি ইসলাম সুনিশ্চিত করেছে। যেটি সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একেবারেই অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আহকাফে বলেছেন- প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তার আমল অনুপাতে নিরুপিত হবে। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পুরামাত্রাই প্রতিদান তাদেরকে দান করে। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না। (আহক্বাফ)

মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-রাসূলে পাক (সাঃ) নিষেধ করেছেন, বেতন ভাতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করার পূর্বে কাজে নিয়োগ করতে। (বায়হাকী)

ইসলাম প্রায়শ ক্ষেত্রে শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্য হতে লভ্যাংশ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কোনভাবে বঞ্চিত করা যাবে না। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইমলামী শ্রম নীতিতেই একমাত্র শ্রমের মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত রয়েছে।

মজুরী বা বেতন পরিশোধ করা

সময়মতো শ্রমিকরে পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হবে। হাদিস শরীফে মানবতার দরদী নবী (সাঃ) সুস্পষ্ট করে বলেছেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবীজি ইরশাদ করেছেন, তোমরা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দাও । (ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার পারিশ্রমিক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়া উত্তম। যা শুধু মানবতার দাবী নয় বরং ইসলামরে একটি নির্দেশও বটে।

মজুরির বিনিময়ে পরিশ্রম করা:-

মানবজীবনে জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়াও একটি অন্যতম পথ বিশেষ। ইসলাম এ ধরণের শ্রমকে খুব সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার পারিশ্রমিক বা মজুরীকে কোন প্রকার কাল বিলম্ব না করে পুরোপুরিভাবে আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআন মাজীদ স্বয়ং নিজেই মানব সমাজকে পরিশ্রমের নিমিত্তে উৎসাহ দিয়ে তাকে দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু ও চিন্তা গবেষণার বস্তুতে নিরুপিত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, তোমরা পরিশ্রম করে যাও । আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল (দ.) আর তোমাদের শ্রমের হিসাব-নিকাশ নিবেন। (সূরা-তাওবা)

কুরআন মাজীদের এই আয়াতে কাজকে যথাযথভাবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং তার ভিতর শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে । আর তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং তার প্রতিদান পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকার জন্যও বলা হয়েছে। পরিশ্রমের মর্যাদা যে কত মহান ও উন্নত সে সম্পর্কে মানবতার দরদী নবী (দ.) বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

যারা কোন পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে নেয়, আল্লাহ তাদেরকে মুহাব্বত করেন। (কুরতবী)

স্বীয় হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্য দ্রব্য থেকে ভাল খাদ্য তোমাদের জন্য আর কিছুই থাকতে পারেনা। (বুখারী)

ইসলাম শ্রমের মর্যাদা ও মহত্তের উপর ভিত্তি করে শ্রমিকদের মজুরী পবিত্রতম একটি অধিকার করে নির্ধারণ করা হয় । শ্রমিক সমাজের ন্যায্য অধিকারকে যে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, তাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহদ্রোহী ঘোষণা দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ বলেন এমন তিনপ্রকার লোক রয়েছে যাদের সাথে আমি নিজেই কিয়ামতের দিন শত্রুতা পোষণ করবো। তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আমার নামে শপথ করে কোন

ওয়াদা করার পর আমার সাথে প্রতারণা করে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ সকল লোক যারা আযাদ নর-নারীকে বিক্রয় করে তার মূল্য গ্রহণ করে। আর তৃতীয় প্রকার হলো তারা যারা কোন শ্রমিককে মজুরি প্রদানের আশা দিয়ে কাজ করার পর তার মজুরি দেয় না। এসব লোকেরা অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার রোষানলে পড়বে। (বুখারী)

উল্লেখিত হাদীস শরীফে একসাথে তিনটি গোনাহের কথা এবং তাদের জন্য একই ধরণের শাস্তি দেওয়ার ঘোষণার মধ্যে একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে শ্রমিকদের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের ফলকে পদদলিত করা। এর ভিতর প্রত্যেকেই স্বীয় দোষকার্য এবং নিজেদের ভিতর যে বিশ্বাসঘাতকতা বর্তমানে রয়েছে এর কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সংগ্রাম ঘোষণার এবং তার নিকট জবাবদিহিতা করার পাত্রে পরিণত হয়। শ্রমিকদের মজুরি না দেওয়া তো দূরের কথা তা যখন তখন আদায় করার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। শুধু পূর্ণরূপে আদায় করলেই হবে না। কাল বিলম্ব না করে তা আদায় করা আবশ্যক। এমনিভাবে তাদের মনের গহীনে এ অনুভূতিও জাগিয়ে তোলা হয় যে, তাদের শ্রমের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে সমাজ জীবনে একটি বিশেষ স্থান দান করা হয়েছে। যতদূর পযন্ত দৈনন্দিন জীবণে একান্ত আবশ্যকীয় বস্তুর প্রশ্ন বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে শ্রমিকগণ সাধারণ ও স্বীয় পরিবার-পরিজনের প্রয়াজন পূরণার্থে স্বীয় পারিশ্রমিকের মুখাপেক্ষী হয়। যে কারণে মজুরি পাবার বেলায় বিলম্ব হওয়াটা তার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক হয়ে দাড়ায়। তার প্রাপ্য তাকে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম । অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় শ্রমিক শ্রেণীর কথা। মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় থাকলে জাতীয় উন্নয়নে সুফল উপলব্ধি করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-, মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করবে। (সূরা-হুজরাত)

মালিককে শুধু যে শ্রমিকের সুখ-সুবিধা, আচার বিনোদনের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে শ্রমিকদের সর্ব বিষয়ে নজর রাখলে উন্নয়নের গতি বেড়ে যাবে। তাই সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত মালিক শ্রমিক সুসম্পর্ক।

লেখক: প্রভাষক, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল (এম এ) মাদরাসা

মাসিক ঈমানের আলোর সার্বিক সাফল্য কামনায়....

সনজরী পাবলিকেশন
SANJARY PUBLICATION

ইসলামী শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয়ে ঐতিহ্যভিত্তিক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য....

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
৮১, শাহী জামে মসজিদ, সুপার মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

SANJARY PUBLICATION
সনজরী পাবলিকেশন
sanjarypublication@gmail.com

01613-160111, 01842-160111, 01971-160111, 01925-132031

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ

২৭ এপ্রিল ২০১৮ইং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা "গ্লোবাল সামিট অফ উইমেন" বাংলাদেশ সহ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী শিক্ষা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জন্য তাঁকে গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। যে সব নারী তাদের বাগ্য অপরিবর্তনের জন্য স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সম্মানসূচক এ অ্যাওয়ার্ডটি সেসব নারীদের উৎসর্গ করছেন। এ সম্মান সূচক অ্যাওয়ার্ড গ্রহনের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এবং সম্মানবোধ করছি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের আমন্ত্রনে এই উইমেন্স লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড নিতে ৩ দিনের সফরে প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা সিডনি গিয়েছেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে অস্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রন জানানোর জন্য ম্যানকম টার্নবুলকেও ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়ন এবং নারী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে একটি নতুন জোট গঠনের তাগিদ দেন একই সঙ্গে এ লক্ষ্যার্জনে ৪ দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

প্রথমতঃ নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করতে প্রচলিত একমুখী ধারনা পরিহার করা, দ্বিতীয়তঃ প্রান্তিক ও ঝুকির মুখে থাকা নারীরা এখনও কম কাদ্য পাচ্ছে। স্কুলে যেতে পারছেনা, কম মজুরীতে কাজ করছে এবং সহিংসতায় শিকার হচ্ছে। তাই কোন মেয়েকে পেছনে রাখা উচিত নয়। তৃতীয়তঃ নারীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সুনির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হবে। চতুর্থতঃ জীবন ও জীবিকা, সকল ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরী করতে হবে। এছাড়াও তিনি নারীদের প্রতি সম্মান ও অধিকার নিশ্চিতে একটি জোট গঠন এবং আপন অবস্থানএতকে সকলেরই নারীদের জন্য কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত বিএনপির মানববন্ধনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

খালেদা জিয়ার মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য এখন একটিই আমাদের দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। আর এর জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমেই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আনতে হবে। গত বুধবার নয়া পল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বানোয়াটা মামলায় সাজা প্রদানের প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে তার নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে মানববন্ধন কর্মসূচী দিয়েছিল বিএনপি।

ঘোষিত সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ের সামনে মানবন্ধন করেছেন দলের নেতাকর্মীরা। যেখানে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করে।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)